স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

মার্চ ২০২৪ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মার্চ ২০২৪ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চ ২০২৪ গণভবনে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

অগ্নিঝরা মার্চ মাস। উনিশশ একাত্তর সালের মার্চ মাস– প্রতিটি দিনই ছিল স্বাধীনতার একেকটি মাইলফলক। পহেলা মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে বাঙালি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে স্বাধীনতার পথে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দেন। এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি শুরু করে প্রতিরোধ যুদ্ধ। ভাষণটি ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা পরিচালনা করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গভীর রাতে (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগে অর্জিত হয় স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা দিবসকে গুরুত্ব দিয়ে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এবারের সংখ্যাটিতে রয়েছে বিশেষ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। *বাংলার বাণী* পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে গণহত্যা' বিশেষ সংখ্যা থেকে জহির রায়হানের একটি প্রবন্ধ, আন্তর্জাতিক ব্রিটিশ সাংবাদিক এন্থনী ম্যাসকারণহাসের একটি রিপোর্ট ও 'বিশ্ব জনমত' শীর্ষক একটি রিপোর্ট এ সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে স্বাধীনতা দিবস সংখ্যাটি। আশা করি, মার্চ সংখ্যাটি সকল পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক | কাজী শাম্মীনাজ আলম

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/প্রতিবেদন

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ৪
জহির রায়হান

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ৯
ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে গণহত্যা ১৯৭১ ১৪
ড. মুনতাসীর মামুন

মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, এসডিজি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ২১
মফিদুল হক

১৯৭১-এর গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন এবং একটি অপ্রকাশিত দলিল ২৪
হারুন রশীদ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২৯
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

দেশের অগ্রযাত্রায় নারীর ভূমিকা ৩১
ফারহানা রহমান

এন্থনী ম্যাসকারণহাসের প্রথম রিপোর্ট ৩৩

মুক্তিযুদ্ধে সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা ৩৬
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ৪০
কামরুন-নাহার-মুকুল

বিশ্ব জনমত ৪৩

বাংলাদেশের ছড়ায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ৪৫
ড. আশরাফ পিন্টু

শহিদ আবু সুফিয়ান: একটি রক্তাক্ত ইতিহাস ৪৭
মিয়াজান কবীর

জেলা পর্যায়ে কর্মসংস্থান দরকার ৪৮
মোতাহার হোসেন

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ৫০
শারমিন ইসলাম

বীমা শিল্প ও বাংলাদেশ ৫২
সুভাষ চন্দ্র

গল্প

নূর হোসেনের পদধ্বনি ৫৪
ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

ইদু পাগলও শহিদ হয়েছিল ৫৮
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৬২-৬৬

বিশেষ প্রতিবেদন ৬৭-৭৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি : না ফেরার দেশে কণ্ঠশিল্পী হাসিনা মমতাজ ৮০

মুদ্রণ: এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ, ৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

DECLARATION OF INDEPENDENCE

BY

THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY HOURS OF 26TH MARCH, 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

Sheikh Mujibur Rahman
26 March, 1971"

Source: THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH [Printed with latest amendment, April, 2016], Sixth Schedule [Article150(2)], Page-177

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১"

সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান [সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬], ষষ্ঠ তফসিল [১৫০(২) অনুচ্ছেদ], পৃষ্ঠা-১৫২

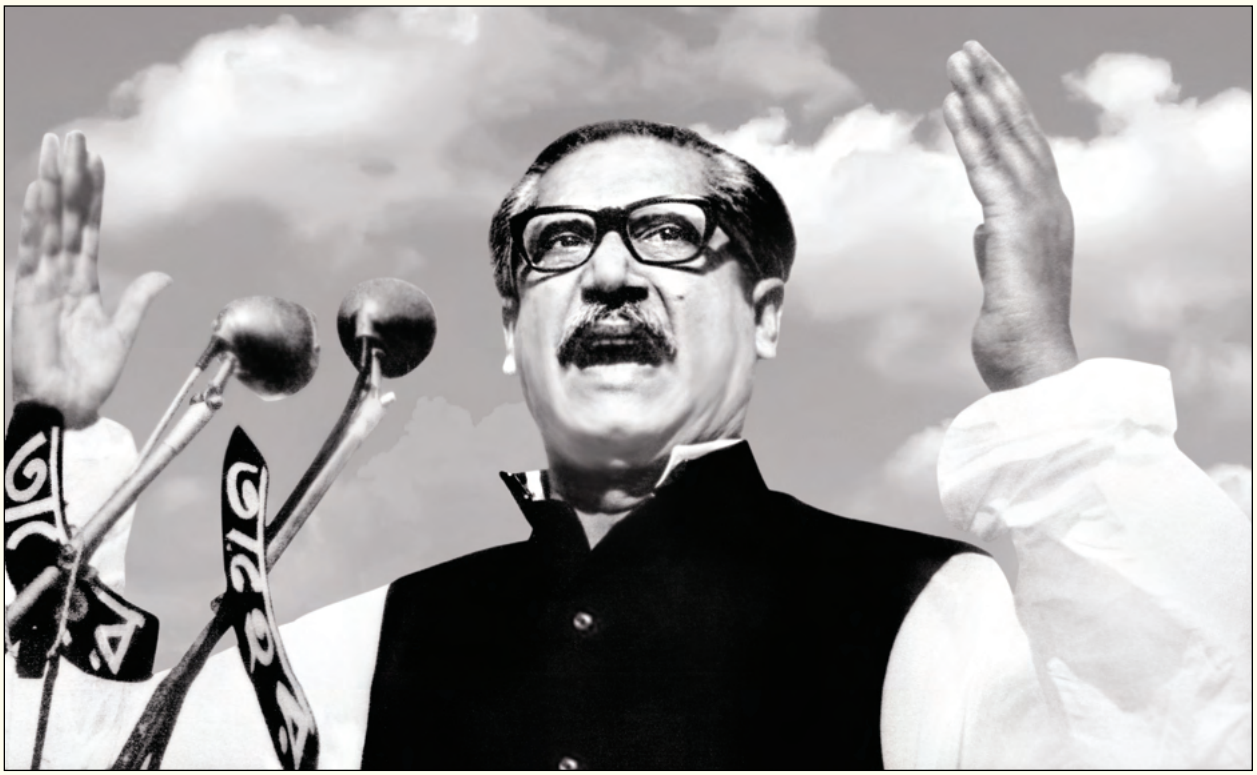

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

জহির রায়হান

পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, পাকিস্তান কখনো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি চক্রান্তের রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং তার আমল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের জাল বিস্তার পেতে থাকে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মির্জা এরাই সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন এবং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির গুপ্ত পথ বেয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি নিয়োগপত্র নিয়ে ক্ষমতায় আসেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় বিভিন্ন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করেন তিনি।

পাঞ্জাবের মালিক ফিরোজ খান নুন আর করাচীর আই, আই চুন্দ্রিগড়ও সেই একই চক্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আইয়ুব খান ছিলেন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন পেশাদার সৈন্য। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। একটি সামরিক জান্তার সহায়তায়। আইয়ুব খানের অনুচর কালাতের খান, মোনায়েম খান, সবুর খান এঁরাও কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গদীনসীন হননি।

পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও ক্ষমতায় এসেছেন সামরিক বাহিনীর দৌলতে, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অন্ধকার পথ বেয়ে, আর তাই লিয়াকত আলী খান থেকে ইয়াহিয়া খান পর্যন্ত পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা, মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

যেহেতু চক্রান্ত, দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের পঙ্কিলতার মধ্যে এই শাসকগোষ্ঠীর জন্ম, লালন-পালন, মৃত্যু– সেই হেতু ওই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রতিই তারা আস্থাবান ছিলেন। জনগণের কথা তারা ভাবতেন না, কিংবা ভাববার সময় পেতেন না। জনগণের কোনো তোয়াক্কা তাঁরা করতেন না। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের চাওয়া-পাওয়া আর দাবী-দাওয়ার প্রতি সব সময় এক নিদারুণ নিস্পৃহতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এই শাসকচক্র।

তাই এই গণবিমুখ শাসকচক্রের হাতে পড়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে। গত তেইশ বছর ধরে ধনীরা আরো ধনী হয়েছে। গরীবের দল আরো গরীব হয়ে গেছে। যেহেতু এই শাসকচক্র পাঞ্জাবী ভূস্বামী, পাঞ্জাবী ধনপতি, পাঞ্জাবী আমলা-মুৎসুদ্দি ও পাঞ্জাবী, সামরিক জান্তার দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, সেই হেতু পাকিস্তানের বাকী চারটি প্রদেশ, পূর্ব বাংলা, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ মানুষ এই শাসকচক্রের হাতে আরো বেশী লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও শোষিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী শোষিত হয়েছে পূর্ব বাংলা ও পূর্ব বাংলার মানুষ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা এই শাসকচক্রের হাতে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের আয়কর বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসত পূর্ব বাংলা থেকে, তবু পূর্ব বাংলাকে তার আয়ের সিকি ভাগও ভোগ

করতে দেওয়া হতো না। সব তারা ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে কলকারখানা তৈরীর কাজে। যদিও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের আয়ের শতকরা সত্তর ভাগ আসত পূর্ব বাংলা থেকে, তবুও শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো মাথাপিছু চার টাকা ছয় আনা তিন পাই, আর পূর্ব বাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র এক পাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু একাত্তর টাকা চার আনা পনেরো পাই, আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র পাঁচ টাকা বারো আনা পাঁচ পাই। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু পাঁচ টাকা দুই আনা সাত পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র নয় আনা ছয় পাই।

বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বছরে মাত্র সত্তর লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে। সেই একই বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয়েছে চার কোটি দশ লক্ষ টাকা। সে বছরে ঢাকা রেডিওর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা।

সেই একই বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিও ষ্টেশনগুলোর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে নয় লক্ষ বারো হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা মাত্র চারজন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার শতকরা ছিয়ানব্বই জন।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূত সদস্যসহ সমস্ত শ্রেণীর বঙ্গবাসী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচ জন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বই জন।

আর দেশরক্ষা বিভাগ? শতকরা ৯১.৯ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী, আর শতকরা ৮.১ ভাগ পূর্ব বাঙালী। কি নিদারুণ বৈষম্য, কি ভয়াবহ শোষণ। পূর্ব বাঙলার সদাজাগ্রত মানুষ তাই সংঘবদ্ধভাবে এই শোষণের অবসান দাবী করল। স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তুলল তারা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথাই বলা হয়েছে, তার বেশী কিছু নয়।

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোন বিরোধ ছিল না, এখনও নেই। পাকিস্তানের যে-কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপরে যে-কোনো রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ সবসময় সোচ্চার হয়েছে। পূর্ব-বাংলার জনগণ শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধিকার চেয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের দাবী তুলছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের দুর্বল প্রদেশগুলোর ওপরে যখন শাসকচক্র জোর করে এক ইউনিটের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, তখন পূর্ব-বাংলার জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও এক ইউনিটের বিলোপ সাধনের দাবী তুলেছে।

বেলুচিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর যখন জঙ্গীশাহী আইয়ুব তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে যখন অসংখ্য নরনারীকে লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলী চালিয়েছে তখন পূর্ব বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে, এই গণহত্যার নায়ক আইয়ুব খানের বিচার দাবী করেছে।

পাকিস্তানের শাসকচক্র সব সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে এবং

সেই বিরোধের ঘোলা জলে নির্বিঘ্নে সাঁতার কেটে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। সারা পাকিস্তান একসঙ্গে আইয়ুব খানের ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল পূর্ব-বাংলা: সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান আর পাঞ্জাবও একসঙ্গে গর্জে উঠলো।

খাইবার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রতিটি স্তরের মানুষ গণতন্ত্রের পতাকা হাতে নিয়ে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম দিল।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সারা পাকিস্তানের মানুষ দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হলো গণবিমুখ শাসকচক্রকে উৎখাতের লড়াইয়ে। ১৯৬৯-এর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে, জনতার এই একতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জনতার মধ্যে ভাঙ্গন ও বিরোধ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ম দেয়া। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ, পাঞ্জাবী-পাঠান বিরোধ, শিয়া-সুন্নি বিরোধ। অতীত ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যখনই শাসক শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, যখনই গদিচ্যুত হবার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে, তখনই যে কোন একটি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথে চালিয়ে আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করেছে তারা।

১৯৬৯-এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেও যখন শাসকচক্র ব্যর্থ হলো, তখন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আইয়ুব খান সরে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান চক্রান্তের পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলেন। মুখে বলতে লাগলেন, প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আসলে তার পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হতে লাগলেন। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লাগিয়ে দেয়া। সকল দলের সঙ্গে সামনে তাল রেখে চলছিলেন তিনি। নিজেকে সাধুসজ্জন হিসেবে উপস্থিত করছিলেন সবার কাছে। নির্বাচনের দিন তারিখ ঘনিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হলো পূর্ব বাংলার মানুষ। সর্বনাশা ঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দশ লক্ষ মানুষ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে প্রাণ হারাল। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কখনো হয়নি। এই দুর্যোগের সময় হাজার হাজার বিদেশী সৈন্য, বিদেশী সাংবাদিক, বিদেশী সাহায্যকারীতে ভরে গেল পূর্ব বাংলার ঝড়-উপদ্রুত অঞ্চল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকচক্রের একটি লোকও এলেন না এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সান্ত্বনা জানাবার জন্যে। বাতাসে অনেক কথা শোনা যেতে লাগল। নানা প্রশ্ন উঠল নানা মহল থেকে। ত্রাণ কাজের নাম করে বিদেশী সৈন্য কেন এসে নামবে আমাদের মাটিতে?

আমাদের সৈন্যরা বসে বসে করছে কি? এত বড় দুর্যোগ ঘটে গেল কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা নীরবে ইসলামাবাদে বসে বসে করছেন কি? বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার আনতে হলো। কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টারগুলো গেল কোথায়, নানা গুজব ছড়াতে লাগল দ্রুত। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক জানালেন, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। দশ লক্ষ লোক তোমরা ঝড়ে হারিয়েছ। কিন্তু আরো দুঃখ আছে তোমাদের কপালে। আরো অনেক প্রাণ তোমাদের দিতে হবে খুব শীঘ্রই। বিদেশী সাংবাদিকের এই উক্তি তখন থেকেই নানা আলোচনা, সমালোচনা, সন্দেহ এবং জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছিল পূর্ব বাংলায়। অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, আমরা কি কোন বিশ্বরাজনীতির দাবা-খেলার ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি।

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলো। যথাসময়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিতও হলো। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সারা পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল পাকিস্তানী নাগরিকরা। নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি প্রদেশে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও একচেটিয়া শোষণের অবসানকামী দুইটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দল দুটি হলো, আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। আর প্রদেশ তিনটি হলো, পূর্ব বাংলা, বেলুচিস্তান আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। বাকী দুটি প্রদেশ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জয়ী হলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি। পিপলস পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারেও একচেটিয়া শোষণের অবসান ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা গেল, যে সমস্ত দল ও গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের জোয়ালে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে– সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে বর্জন করেছে।

পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের ফলাফল গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি দখল করলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের এই বিজয়ের পেছনে যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমর্থন ছিল তার প্রমাণ হলো ঢাকার মীরপুর, মোহাম্মদপুর, খুলনার খালিশপুর, রংপুরের সৈয়দপুর ও ঈশ্বরদী প্রভৃতি অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে, মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম নামক সাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীদের পরাজিত করেছে।

নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্রের নাভিশ্বাস তুলে দেয়। তাঁরা ভেবেছিলেন নির্বাচনের কোন একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা নিয়ে কলহ দেখা দেবে এবং সেই কলহের সুযোগ নিয়ে পুরান পাপীরা আবার নতুন করে ক্ষমতা দখল করে বসবে।

কিন্তু ফলাফল যখন উল্টো হয়ে গেল, তখন আবার চক্রান্তে লিপ্ত হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারক-বাহক পাকিস্তানের শাসকচক্র। আবার সেই পুরনো বিভেদের রাজনীতির দাবা-খেলা শুরু করল তারা এবং এই দাবা-খেলার সুযোগ্য সহযোগী হিসাবে ভুট্টো আর কাইয়ুম খান দু'জনেই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের গোত্রীভুক্ত।

খান আবদুল কাইয়ুম খান হলেন সেই হিংস্র বর্বর রাজনীতিবিদ যিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সীমান্ত দলকে গণহত্যা আর জেল-জুলুমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

আর জুলফিকার আলী ভুট্টো হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র হিসেবে তার মন্ত্রিসভায় থাকাকালীন ছয় দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। পরে আইয়ুব খানের সভাসদের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সহসা সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাতে থাকেন। আসলে তিনি একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী, বৃহৎ ভূস্বামী।

ভুট্টো এবং কাইয়ুম খানকে দলে টেনে নিজেদের শক্তিশালী করলেন শাসকচক্র। তাঁরা দেখলেন পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার। তাদেরকে যদি চিরতরে দাবিয়ে দেয়া যায় তাহলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু আর সীমান্ত প্রদেশের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকেও বানচাল করে দেয়া যাবে। এক ঢিলে চার পাখি মারতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

তাই নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শাসকচক্র নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের মাধ্যমে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ও তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মাটিতে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টাও করলেন তারা, তাদের অনুচর মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম আর নেজামে ইসলামের দালালদের মাধ্যমে। কিন্তু পূর্ব বাংলার সদা সচেতন মানুষ এই প্ররোচনায় সাড়া না দেওয়ায় শাসকচক্র আবার বিপদে পড়ে গেলেন।

তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো মুখোশ কিছুটা খুলতে বাধ্য হলেন। শাসকচক্রের কলের পুতুল ভুট্টো হঠাৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি জানলেন, জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত বৈঠক পিছিয়ে দিতে হবে, নইলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন তিনি। তিনি জানালেন, জাতীয় পরিষদের সভা বসার আগে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতার বিলিবণ্টন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। তা না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা যাবে না।

এই ধরনের একটি অযৌক্তিক দাবী ও অন্যায় আবদার গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল হলেও এটাই ছিল শাসকচক্রের চক্রান্তের আসল চেহারা, গোপন বৈঠক ও আলোচনায় স্থির করা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর ইয়াহিয়া খান যে এই সিদ্ধান্তের অন্যতম ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ভুট্টোর হুমকির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের ৩রা মার্চের আহূত সভা কোনো কারণ না দেখিয়েই অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতবী ঘোষণা করে দিলেন। যদিও জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তখন পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে ঢাকায় এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এর মধ্যে কাইয়ুম খান ও ভুট্টোর দল ছাড়া অন্য সব দলের সদস্যরা ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের এই হঠকারী ঘোষণা স্বাধিকারকামী পূর্ব বাংলার জনগণের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিল। শাসকচক্রের চক্রান্ত বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানালেন। জনগণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এই অহিংস জনতার

ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলীবর্ষণ করল। সহসা ঢাকা শহরে কারফিউ জারী করে একরাতে তার বর্বর সৈন্যরা প্রায় দু-হাজার দেশপ্রেমিককে খুন করলো। কিন্তু এই প্ররোচনার মুখেও শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। জনগণ শান্ত রইল। তখন শাসকের ভাড়াটে দালালরা পূর্ব বাংলার বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাধাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন পূর্ব বাংলার বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাঙালী-অবাঙালী সমান অধিকারের দাবীদার, সবাই পরস্পরের ভাই।

শাসকচক্র দাঙ্গা বাঁধাতে ব্যর্থ হলো। কিন্তু অহিংস জনতার ওপরে তাঁরা গুলিবর্ষণের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসনের প্রধান ও গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করে ঢাকায় পাঠানো হলো।

জেনারেল টিক্কা খান হচ্ছেন সেই জেনারেল যিনি বেলুচিস্তানের নিরীহ জনগণ যখন ঈদের নামাজে অংশ নেওয়ার জন্যে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁদের ওপরে বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে ও মেশিনগান চালিয়ে কয়েকশ বালুচকে হত্যা করেন। সেই টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলায় পাঠানো তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টিক্কা খান এলেন এবং তার কিছুদিন পরে ইয়াহিয়া খানও দলবল নিয়ে এলেন ঢাকার। ১৬ই মার্চ তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুখে আলোচনার বাণী এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত আর অন্যদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক বিরাট সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন ইয়াহিয়া আর তার সামরিক জান্তার প্রধানরা।

জল এবং বিমান পথে হাজার হাজার সৈন্য আমদানী করলেন তারা পূর্ব বাংলার মাটিতে। সামরিক নিবাসগুলোকে আরও সুদৃঢ় করলেন। ঢাকার সৈন্য শিবির ও বিমান পোতের চারপাশে অসংখ্য বিমানধ্বংসী কামান বসান হলো। মেশিনগান বসান হলো বিমান পোতের আশেপাশের বাড়ীর। একদিকে আলোচনার প্রহসন চলল আর অন্যদিকে চলল দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল

এল সেইদিন যে দিনটার জন্যে পাকিস্তানের শাসকচক্র ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে অপেক্ষা করছিল। রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে মিথ্যেবাদী তস্কর ইয়াহিয়া খান চুপি চুপি ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং যাবার আগে তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাংলার নিরীহ-নিরপরাধ-নিরস্ত্র মানুষ নিধনযজ্ঞে।

ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণহত্যা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার, বোমারু বিমান ব্যবহৃত হলো নিরস্ত্র মানুষকে মারার জন্য।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করল তারা।

কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী-পুরুষ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, ছাত্র, কেরানী, বুদ্ধিজীবী কেউ বাদ গেল না তাদের এই নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে। ইয়াহিয়া খানের হিংস্র সেনারা সোনার অসউইজ আর বুখেনওয়ালডের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিল।

মৃত্যুর এই বিভীষিকার মধ্যে অসহায় বাংলার মেহনতি মানুষ তার দুর্জয় মনোবল আর সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে। বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই, পি, আর, আনসার আর পুলিশ বাহিনী তাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য অস্ত্র তুলে নিল হাতে। আর অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পুরো দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করতে লাগল। হিংসার এই উন্মত্ততার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠন ছাড়া আর অন্য কোন পথ রইল না। বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিরা তাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৃত। পাকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্যে বাংলাদেশের মানুষ দায়ী নয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসকচক্র, যারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষ লক্ষ মৃতের লাশের নীচে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। পাকিস্তানের এই মৃত্যুর জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলও দায়ী নয়। দায়ী লিয়াকত আলী খান থেকে শুরু করে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মির্জা, খাজা শাহাবুদ্দিন, খান আবদুল কাইউম খান, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সবুর খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, আর জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রভৃতি গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী রাজনৈতিক স্বার্থ শিকারীর দল। যারা গত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে।

বাংলা এখন প্রতিটি বাঙালীর প্রাণ।

বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।

সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা সেখানে মানুষ প্রাণ ভরে হাসতে পারবে, সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবে।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে।

লড়ছে সর্বাধুনিক সজ্জিত এক পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে। লড়ছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে অর্জন করার জন্য।

বাংলার মানুষের এই মুক্তির লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত অঞ্চলের মেহনতি মানুষকেও শোষণমুক্ত হবার প্রেরণা যোগাচ্ছে।

[বাংলার বাণী পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে গণহত্যা' শীর্ষক বিশেষ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

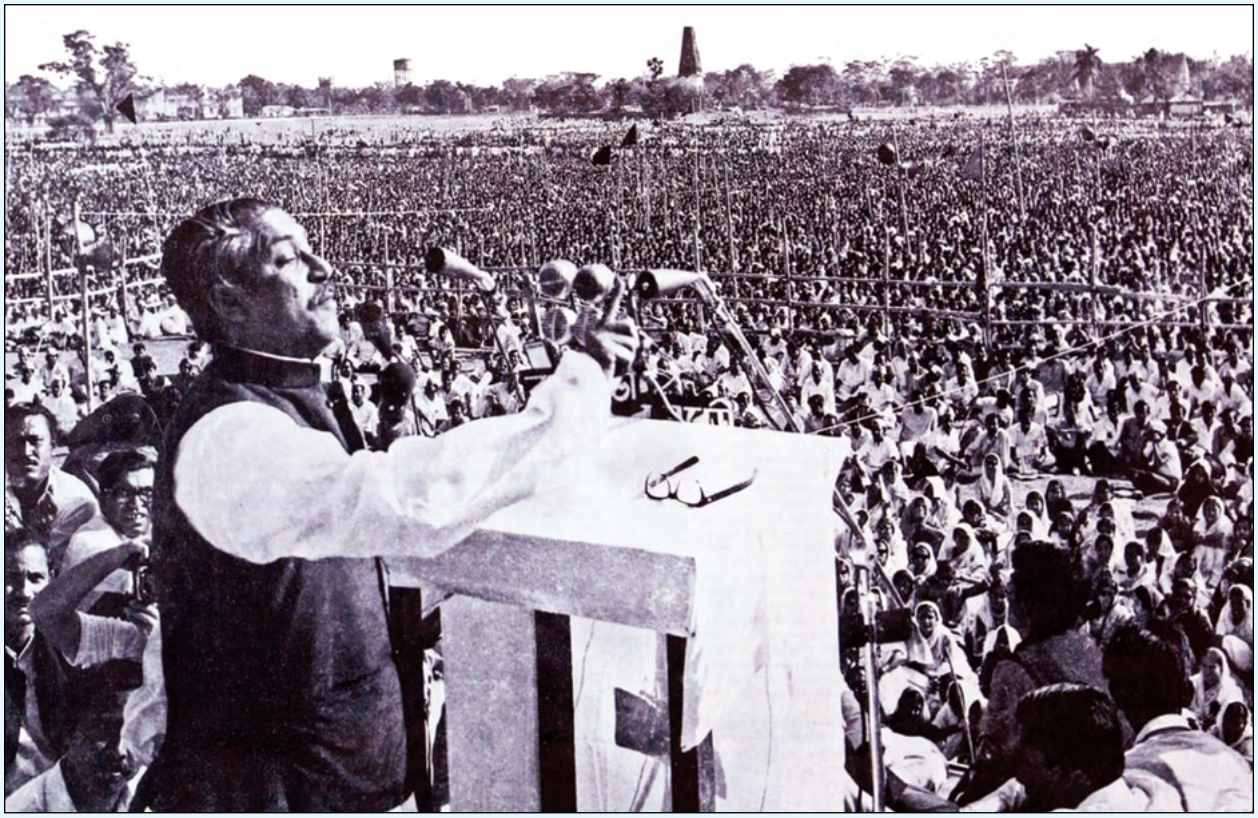

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধুর ন্যায় মুক্তমনা, উদার ও স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নে প্রোজ্জ্বল একজন অবিসংবাদিত নেতা বাঙালি জাতি পেয়েছিল বলেই পৃথিবীর মানচিত্রে আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে। বাঙালি জাতি পেয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনকৃতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সংক্ষিপ্ত ৫৫ বছরের জীবনে কতটা চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। বাঙালির মুক্তির এই মহানায়কের মস্তিষ্ক ও শিরাধমনীতে সর্বদা প্রবাহিত ছিল স্বাধীনতার চিরন্তন দীপ্তি। জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবনের পুরোটা সময় সকল মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর যে অতুলনীয় ঔদার্যময় চিন্তাশীলতা ও কর্মকুশলতা আমরা লক্ষ করি তাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে তিনি ছিলেন মানবমুক্তির অগ্রদূত।

মানবমুক্তির পথপরিক্রমায় সদা ব্যাপৃত বঙ্গবন্ধুর ৪৬৮২ দিনের কারাজীবনের অতি অল্পই প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গবন্ধু রচিত *কারাগারের রোজনামচা* নামক ২০১৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত গ্রন্থে। কিন্তু পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আমলের পুরোটা সময় তিনি কীভাবে শাসকদের নজরবন্দিতে ছিলেন তার প্রমাণ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নথিপত্র থেকে প্রকাশিত *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman* নামক গ্রন্থে। আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা টেলর এন্ড ফ্রান্সিস এই মূল্যবান দলিলের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা লন্ডনে অনুষ্ঠিত এ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বলেন যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের সংগৃহীত সকল তথ্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে।

বাঙালির প্রধান মিত্র হওয়ার কারণেই তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঔপনিবেশিক শাসকেরা পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ও মুক্ত মানুষ হিসেবে প্রাপ্য সকল মৌলিক অধিকার থেকেও দশকের পর দশক তাঁকে বঞ্চিত রাখে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয় চীন* গ্রন্থত্রয় পাঠ করলে পাঠকেরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে ১১১ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কেন লিখেছিলেন 'মুক্ত করো হে মুক্ত করো আমারে'।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র জন্মোৎসবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, 'রক্ত দিয়ে আমরা রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু সত্য, শ্রেয়, ন্যায় ও স্বজাত্যের যে চেতনা বাঙালি কবিগুরুর কাছ থেকে লাভ করেছে আমাদের স্বাধিকার সংগ্রামে তারও অবদান অনেকখানি। বাঙালির সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে, বাঙালি তার বুকের রক্ত দিয়ে রবীন্দ্র অধিকারকে বাংলাদেশের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। (*দৈনিক বাংলা*, ৮ই মে ১৯৭২)

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম বাণী ছিল :

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই–
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের পরপরই বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধির প্রশ্ন স্যার, 'আজকের দিনে জাতিকে আপনি কি বাণী শুনাবেন?'

জবাবে বঙ্গবন্ধু তাঁর চোখে-মুখে স্বভাবসুলভ উদার হাসি মাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করেন (*ইত্তেফাক*, ১৩ই জানুয়ারি ১৯৭২) রবীন্দ্রনাথের রচিত 'সুপ্রভাত' কবিতাটির একাংশ যা উপরে উদ্ধৃত। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রভাতক্ষণে 'সুপ্রভাত' কবিতার মাধ্যমে জাতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অভয় বাণী গভীর তাৎপর্যবহ। অধিকারহীন, বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের মুক্তি ও স্বার্থরক্ষায় বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়স থেকেই যে কীভাবে অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থদ্বয়ের পাতায় পাতায়।

১১ই নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কোর প্যারিস সদর দপ্তরে ৪১তম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রবর্তিত 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক সৃজনশীল অর্থনীতি পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে বিশ্বের আর্থসামাজিক-বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান ও আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অদ্রে আজুলে উপস্থিত ছিলেন যেখানে প্রথমবার এ পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে উগান্ডার কাম্পালায় অবস্থিত এম ও আই টি ভি ক্রিয়েটিভ লিমিটেড যারা ইতোমধ্যে ৭০০ মানুষের কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করেছে ও ১০০টি ব্যাবসার সম্প্রসারিত বাজার সৃষ্টি করেছে। যুব প্রজন্মের শিক্ষা, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি তার সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে ইউনেস্কো জানিয়েছে।

ভাষা হচ্ছে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রের মূল চালিকাশক্তি। মায়ের ভাষাতেই আমরা খুঁজে পাই জীবন-জীবিকার প্রাণশক্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর অযৌক্তিক ঘোষণার কারণেই ভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে অধ্যয়নরত তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের এই অদ্ভুত কাঠামোতে আর যাই হোক বাঙালির মুক্তি সম্ভব নয়। বাঙালির মুক্তির জন্য প্রয়োজন তাদের স্বাধীন মাতৃভূমি।'

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৬ই মে তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ।' (*দৈনিক বাংলা*, ৭ই মে ১৯৭২)

পৃথিবীর প্রতিটি মাতৃভাষাই যে গুরুত্বপূর্ণ সেই বোধটি এসেছে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে। ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে ১৯৯৯ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে সমগ্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

ইউনেস্কোর ২১০তম নির্বাহী বোর্ডের সভায় 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক সৃজনশীল অর্থনীতি পুরস্কার' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুজিব শতবর্ষের এই সময়ে বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য এ পুরস্কার ঘোষণা বিশ্বের যুবসমাজকে দারুণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে ইউনেস্কো মহাপরিচালক অদ্রে আজুলে যে বাণী দিয়েছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন সর্বদাই অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর ভাষায়, 'It is certain that Bangabandhu's legacy will continue to be a great source of inspiration for generations to come and for those working to reinvent the world. The UNESCO shares this aspiration for an inclusive, equitable, and democratic society – a dream that Bangabandhu presented on March 7, 1971 in a historic speech now inscribed on UNESCO Memory of the World International Register.'

ইউনেস্কোর ১০ম মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঘোষণা করেন যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য-স্মারক তালিকায় (Memory of the World International Register) সংযোজিত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য-স্মারক তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে ইউনেস্কো।

মানবসভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সহজে অভিগম্য করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো এই কর্মসূচি গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক সাময়িকী *নিউজ উইক* কর্তৃক 'রাজনীতির কবি' বলে অভিহিত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির মহাকাব্য। রাজনীতির লক্ষ্য যদি হয় জনগণের কল্যাণ, তাহলে স্বাধীনতা অর্জন ও সমুন্নত রাখাই হবে জনকল্যাণের সর্বোচ্চ ধাপ। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির মহাকাব্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্তপর্বে ৭ই মার্চের এই ভাষণ গোটা জাতিকে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। জাতির পিতার এই সম্মোহনী ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্রই ছিল ৭ই মার্চের এই অনন্যসাধারণ ভাষণ।'

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে মানবমুক্তির চিরন্তন সত্যটি জোরালোভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং অন্ধকারকে পেছনে ফেলে আলোর পথে যাত্রার গতিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের বিশ্ব প্রাসঙ্গিকতা চিরদিন থাকবে কারণ বাঙালির মুক্তি তথা মানবমুক্তি একটি শাশ্বত সত্য যার ওপর ভিত্তি করে মানবসভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসবিদ ও লেখক জ্যাকব এফ ফিল্ড সম্পাদিত *We Shall Fight On The Beaches* গ্রন্থে পুরো পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছে এমন ৪১টি ভাষণের মাঝে স্থান করে নিয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩১ সাল থেকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়কালের ইতিহাসে যে ভাষণসমূহ মানবসভ্যতায় স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে, কালজয়ী অনুপ্রেরণাদায়ী সে ভাষণগুলোই এ গ্রন্থের আধেয়।

একটি ভাষণ যে কত শক্তিশালী হতে পারে, নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তর করতে পারে ও পরাধীন বাঙালিকে স্বাধীন জাতিসত্তা দিতে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ। সাতই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের চিত্র উত্থাপন করে পরবর্তী দিন আট মার্চ তারিখের *দৈনিক ইত্তেফাকে* 'উত্তাল-উদ্দাম জলধিতরঙ্গ' শিরোনামে লেখা হয়– '৭ মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অনন্যসাধারণ এই দিনের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান। অবিস্মরণীয় এই অনন্যদিনের রেসকোর্সে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নির্দেশকামী স্বাধিকার সৈনিকদের সংগ্রামী সম্মেলন। সংগ্রামী বাংলা দুর্জয় দুর্বিনীত।'

অধুনালুপ্ত *দৈনিক পাকিস্তান* 'লক্ষকণ্ঠের বজ্রশপথ' শিরোনামে পরদিনের (৮ই মার্চ ১৯৭১) পত্রিকায় বর্ণনা করে– 'লক্ষ হস্তে শপথের বজ্রমুষ্টি মুহুর্মুহু উত্থিত হচ্ছে আকাশে। জাগ্রত বীর বাঙালির সার্বিক সংগ্রামের প্রত্যয়ের প্রতীক, সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতীক বাঁশের লাঠি মুহুর্মুহু স্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে। এই ছিল রবিবারের (৭ই মার্চ ১৯৭১) রমনার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সভার দৃশ্য।'

'জয় জনতার জয়' শিরোনামে *দৈনিক ইত্তেফাক* পরদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ ১৯৭১ তারিখে রিপোর্ট করে যে গভীর রাত্রিতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, 'সামরিক কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ঢাকা বেতার হইতে শেখ মুজিবুর রহমানের রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ প্রচারের অনুমতি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সোমবার (৮ই মার্চ ১৯৭১) সকাল সাড়ে ৮ ঘটিকায়, ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে শেখ মুজিবুর রহমানের রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ প্রচার করা হইবে। বাংলার অন্যান্য বেতারকেন্দ্র হইতেও ইহা রিলে করা হইবে।'

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ একাত্তরের অপরাহ্নে যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বেতার-টেলিভিশন বন্ধ করার যে ঘটনা ঘটিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকেরা, ঠিক তেমনই ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। ৮ই মার্চ ১৯৭১ তারিখের সংখ্যায় অধুনালুপ্ত *দৈনিক আজাদ* 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র নীরব' শিরোনামে নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করে : 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র গতকাল রবিবার সহসা স্তব্ধ হইয়া যায়। অপরাহ্ণ ৩টা ১৫ মিনিট হইতে এই কেন্দ্র আর কোন অনুষ্ঠান প্রচার করে নাই। কবে আবার এই কেন্দ্র চালু হইবে– সংশ্লিষ্ট কোনো মহলই গতকাল তাহা জানাইতে পারে নাই।'

"গতকাল বেতারে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ প্রচারের কথা ছিল। তদানুযায়ী ব্যবস্থাও করা হয়। বঙ্গবন্ধু যখন রেসকোর্সে বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' এই গানটি প্রচার করা হয়। কিন্তু নেতার বক্তৃতা শুরু হওয়ার পর নাকি একটি মহল ইহা রিলে করিতে বাধা দেয়। অতঃপর, রেসকোর্স ময়দান হইতেই শেখ মুজিবুর রহমান বেতারের বাঙালি কর্মচারীদের অসহযোগ শুরু করার আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া রাস্তায় নামিয়া আসে এবং বেতারও স্তব্ধ হইয়া যায়।" (*দৈনিক আজাদ*, ৮ই মার্চ ১৯৭১)

ঐদিন অর্থাৎ ৭ই মার্চ (১৯৭১) সন্ধ্যায় ঢাকায় অবস্থানরত গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'শেখ মুজিবের গৃহীত সকল ব্যবস্থাই যুক্তিসংগত এবং সংখ্যাগুরু প্রতিনিধির বৃহত্তম দলের প্রধান হিসাবে শেখ মুজিবের দেশকে শাসন করার ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে এই অনন্যতম ভাষণের ভূমিকা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ভাষণটি আজ আমাদের সংবিধানের অংশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ই মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়মকানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে এ ঐতিহাসিক ভাষণে।

প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচারতত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। প্রায় এক হাজার একশত সাতটি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই – আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।

ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে – 'There is nothing like a good beginning for a speech'। বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগতত্ত্বে যা বলা হয় (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এ যুগান্তকারী ভাষণে।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভায়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা,

রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা– যা পুরো বক্তৃতার মূলভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতাকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে।

পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ই মার্চের এ বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধস্লোগান। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে বক্তৃতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, মাত্র আঠারো দিন পর তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণই ছিল কার্যত (de facto) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না'– বঙ্গবন্ধুর এই উচ্চারণ প্রসঙ্গে প্রয়াত সাংবাদিক-সম্পাদক কামাল লোহানী বলেছিলেন, 'সংসদীয় রাজনীতির অঙ্গনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার এই বলিষ্ঠতা একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই দেখাতে পেরেছিলেন বলে তিনি জাতিরাষ্ট্র-স্রষ্টা এবং মুক্তিদাতা হিসেবে মহত্ত্ব অর্জন করেছিলেন।'

জনযোগাযোগে যেসব speech-idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে বক্তৃতায়। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলার জনগণের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ এ বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ সাবলীল ভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে রচিত এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি: কী অন্যায় করেছিলাম? কী পেলাম আমরা? কীসের আর.টি.সি.? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব?

বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধ সৃষ্টিতে 'ask question and then answer' পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। পুরো ভাষণে বর্তমানকালের যৌক্তিক ব্যবহার বক্তৃতাটিকে সজীবতা দিয়েছে। আবার কথোপকথনের ধারার স্বার্থে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এ বক্তৃতায়।

বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বহু গবেষণার পর যোগাযোগতাত্ত্বিকদের declarative বাক্য সংক্ষিপ্ত করার বর্তমান নির্দেশিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যথাযথ প্রতিফলিত। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, '২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন'; 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো'; 'সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে'; 'যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল– কেউ দেবে না'; 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'।

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিতি করানোই নয়, বরং তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তাঁর এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহমূলক বক্তব্য– 'তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।' সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এ বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিক উদারতার কোনো হেরফের কখনও যে ঘটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ই মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্ম-মৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব' বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন– 'তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।' কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান উদার-হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যথাযথ তথ্য চয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর তীক্ষ্ণ যুক্তিবিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়– 'যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এক সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় যোগাযোগবিজ্ঞানে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যজনকভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, 'তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।'

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে যেয়ে বঙ্গবন্ধু 'put up the attribution first'-এর নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করে তারপর তাঁর মন্তব্য/বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। যেমন– 'ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না' কিংবা 'ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি

বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম' ইত্যাদি। সার্বজনীন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ (agenda setting function) যা বঙ্গবন্ধুর এ বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে বার বার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদানকালেও বঙ্গবন্ধুর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির (humanistic approach) যে-কোনো তারতম্য ঘটত না– তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য : 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, ফৌজদারি আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে– কিন্তু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো-ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না।'

জনযোগাযোগে ব্যক্তি বা ঘটনার মর্যাদা আরোপণ (status conferral function) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশে এ বিধানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন– তিনি বলেছেন, 'আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন' কিংবা 'আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।'

সার্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপন (posing a challenge) সর্বজনবিদিত একটি পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে যখন বলেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো– এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ'– তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগবিদ্যার শিল্পকুশল প্রণালিতে পরম দক্ষতায় কীভাবে শ্রোতাদের বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন।

যে-কোনো বক্তৃতার সংজ্ঞানির্ধারণী অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের শেষবাক্য 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা, যা ৭ই মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত।

আমরা জানি যে, বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হয়। একাত্তরের ৭ই মার্চ তারিখে প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তট-অতিক্রমী ভাষণ তেজস্বী বক্তৃতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল – তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বরসংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল – তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। সার্বজনিক বক্তৃতাবিশারদ, গবেষক ও যোগাযোগবিদদের জন্য এ ঐতিহাসিক ভাষণ একটি আবশ্যিক পাঠক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তাচেতনা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলিত ও স্বচ্ছ উপস্থাপনা সার্বজনিক সম্ভাষণ বা Public Address-এ অন্যতম শর্ত।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দচয়নে মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোন টীকা বা নোট ব্যতিরেকে এমন নির্মেদ ও নির্দেশনামূলক ও একই সাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী *নিউজ উইক* তখনই বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ই এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধে। এ বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। শব্দের এমন সুপ্রযুক্ত ব্যবহার সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

এ ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত রাখবে, জীবনসত্য অনুধাবনে পথ দেখাবে ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলনকে দেবে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের মতে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহামানব, সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কে নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন।' বঙ্গবন্ধু যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখাবে। মুক্তির অগ্রদূত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাঙালিকে নয়, বিশ্বের সকল মানুষকে মুক্তি অর্জনে পথপ্রদর্শন করবে নিরন্তর। বঙ্গবন্ধু মানবজাতির মুক্তির ঠিকানা দিয়ে গেছেন ৭ই মার্চের ভাষণে।

তথ্য নির্দেশিকা:

১. ইউনেস্কো ওয়েবসাইট।
২. *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ রাজনীতির মহাকাব্য*, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা, ২০১৭।
৩. *মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৮।
৪. তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকী।

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, প্রাবন্ধিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও উপাচার্য, aams.arefin@gmail.com

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে গণহত্যা ১৯৭১

ড. মুনতাসীর মামুন

১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু প্রথম 'গণহত্যা' শব্দটি উচ্চারণ করেন। তিনি অবশ্য তখন ভাবেননি, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বার বার তাঁকে এ শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে। ১৯৬৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এক গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, ঐ সময় পাকিস্তানি সরকারের নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে শহিদদের প্রসঙ্গে শব্দটি উচ্চারণ করেন। অনেকে প্রশ্ন তুলবেন, ১৯৬৯ সালের শহিদদের আমরা 'গণহত্যার' অন্তর্ভুক্ত করতে পারি কি না। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত 'গণহত্যা' সংজ্ঞার উল্লেখ তারা করবেন। তবে এই সংজ্ঞার সৃষ্টি ইউরোপীয়দের, তাদের দেশের গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে। সময়ের সঙ্গে সংজ্ঞা বদলায়, পরিসর বাড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা যে গণহত্যা চালিয়েছিল তা কি ঐ দিনই শুরু? হঠাৎ গণহত্যা শুরু হয় না। এর প্রক্রিয়া চলে অনেকদিন থেকে।

১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তৎকালীন রমনা রেসকোর্সে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন [তাঁর বক্তৃতার ভুল ইংরেজি উদ্ধৃতি দিই] তার মূল কথা ছিল বাংলা কখনও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা তিনি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করছেন অর্থাৎ বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করছেন না, পাকিস্তানের অন্যান্য জাতি থেকে বাঙালিকে আলাদা করে ফেলছেন, এটি পরিকল্পিত গণহত্যার শামিল। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঐ সময়ই বলেছিলেন, এটি জেনোসাইড। তিনি অবশ্য ১৯২০ সাল থেকেই বাংলা ভাষার পক্ষে বলেছিলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হওয়া দরকার ১৯৪৭ থেকে প্রথমে আবদুল হক থেকে অনেক প্রবন্ধকারই এ দাবি করেছিলেন।

ভাষা সংস্কৃতির অন্যতম বাহন বটে কিন্তু সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানও পাকিস্তান সরকার বিনষ্ট করতে চাইছিল। এটিও গণহত্যার একটি প্রক্রিয়া। শুধু হত্যার মাধ্যমেই কি এথনিক ক্লিনজিং হয়? একটি জাতির ভাষা-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হলে সে জাতির মৌল বৈশিষ্ট্য এবং অনেক ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সেটিতো এথনিক ক্লিনজিংয়েরই আরেক রূপ।

এরপর বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে দাবি না মানা ও গুলি করে হত্যার প্রক্রিয়া চলে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এবং গণহত্যার প্রক্রিয়া এইভাবে ত্বরান্বিত হয়। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে যদি ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ধরি তাহলে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে কতলোক শহিদ হয়েছেন, কম নয়। আমি তো মনে করি ১৯৭১ সালের গণহত্যার শুরুটা হওয়া দরকার ১লা মার্চ থেকে যা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে। এ পরিণতিতে পৌঁছার জন্য ২৫ বছর প্রক্রিয়া চলেছে।

যে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলাম তা দেখি ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেছেন। এই মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ– 'নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যার শামিল এবং সেটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধও বটে।' মানবতাবিরোধী অপরাধের উল্লেখ করেন তিনি ১৯৭২ সালের শুরুতে।

গণহত্যার বিচারের কথা প্রথম বলেন ১৯৭২ সালের ১৫ই জানুয়ারি। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের নুরেমবার্গ ট্রায়ালের মতো বিচার হবে এবং এ জন্য তিনি 'আন্তর্জাতিক বিচারক সমিতি' ও আন্তর্জাতিক ফোরামের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তারা যদি সহযোগিতা না করে তাহলে নিজ পথ বাংলাদেশ বেছে নেবে। (আবু সাঈদ সংকলিত *দিনলিপি: বঙ্গবন্ধুর শাসন সময়: ১৯৭২*; ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩২)

বিজয়ের পরদিন থেকে আমরা দেখছি ঢাকা থেকে শুরু করে সারা দেশে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার আবির্ভাব হয়েছে। এদের তখন বলা হতো 'ষোড়শ বাহিনী'। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর লোকজন এ 'বাহিনী'র সৃষ্টি করছে। তবে এ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ ছিল মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবারের যুবকরা, যারা লুটের মাধ্যমে বিত্ত সঞ্চয় করতে চেয়েছিল।

বস্তুত বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার আগে থেকেই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার। স্বাধীনতার পর ১৮ই ডিসেম্বর *দৈনিক বাংলায়* মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারের দাবি করা হয়। আলবদর বাহিনী যেভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এ দাবি করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারিই 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৭২' জারি করা হয়েছিল। এরপর আরও তিন দফা তা সংশোধন করা হয়।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু প্রায় জনসভায়-ই গণহত্যার বিষয়টি তুলে এনেছেন। বার বার বলেছেন, শুধু দেশীয় গণহত্যাকারীদের নয়, পাকিস্তানি খুনিদেরও বিচার করবেন এবং এ বিষয়ে সন্দেহ না করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং কার্যত তাই করেছিলেন।

১৯৭২ সালের ৮ই মার্চ দালালদের বিচারের জন্য সরকার সারা দেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এটিও কিন্তু বিরল ঘটনা। এ ধরনের উদাহরণ সারা বিশ্বে খুব বিরল যে, স্বাধীনতার তিনমাসের মধ্যে সারা দেশে এতগুলো ট্রাইব্যুনাল গঠন। এরপর সারা দেশ থেকে শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় সদস্যদের গ্রেফতার করা শুরু হয় এবং ৩৭,৪৭১ জনকে আটক করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে এপ্রিল ১৯৭২ সালের মধ্যেই ২৬,৮৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গণহত্যা তদন্ত কমিশনও গঠন করা হয় ১৯৭২ সালের ৫ই এপ্রিল। (তপন পালিত, *মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন: একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভূমিকা*, ঢাকা, ২০১৭)

১৯৭২-১৯৭৩ সালে এত দুর্ভোগের মধ্যেও বিচার নিয়ে দাবি তোলা অব্যাহত ছিল। সরকারও সীমিত সম্পদ দিয়ে যতটুকু করার করছিল। কিন্তু বিচারের বিরোধিতাও ছিল। ভারত প্রথমদিকে বিচার সম্পর্কে কিছু না বললেও, সিমলা চুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পক্ষপাতি ছিল ভারত। বঙ্গবন্ধু এটি চাননি। কিন্তু তাঁর কোনো উপায় ছিল না। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের দেশে ফেরত আনার জন্য চাপ বাড়ছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও বিচারের খুব একটা পক্ষে ছিল না। এমনকি মওলানা ভাসানীও দালাল আইন বাতিলের দাবি তুলেছিলেন।

পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায়, 'পাকিস্তানী সরকার পাকিস্তানে আটকে পড়া বিপন্ন বাঙালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে যুদ্ধাপরাধীদের প্রস্তাবিত বিচারকে এক করে দেখেছে।' পত্রিকা আরও জানায়– বাংলাদেশকে কোনো স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। (*দৈনিক বাংলা*, ৩০শে জুন ১৯৭২)

তারপরও দেখি সরকার ১৯৭৩ সালের ২০শে জুলাই 'আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন ১৯৭৩' সংসদে পাস করে। ইতোমধ্যে বিচারও শুরু হয়েছিল। দণ্ডিত হচ্ছিল অপরাধীরা কিন্তু বিভিন্ন চাপের কারণে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর ১৮টি অপরাধে চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অপরাধগুলোর মধ্যে ছিল খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি। ফলে ২৬ হাজার বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করেন ফলে বিচার বন্ধ হয়ে যায় ও ১১ হাজার ঘাতক-ধর্ষক মুক্তি পায়। জেনারেল জিয়া তাদের সমর্থনে বিএনপি গঠন করেন।

অনেকে এখনও বলেন, বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ঘাতকদের মুক্তি দিয়েছিলেন। আসলে সেটি সত্য নয়। তিনি ঘাতক বা ধর্ষক বা লুটেরাদের মুক্তি দেননি। তাদের বিচার চলছিল। ঘাতকদের মুক্তি দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়া।

এখানে গণহত্যা/ যুদ্ধাপরাধী/ দালালদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর কিছু মন্তব্য সংকলন করা হলো:

১. গণহত্যার তদন্ত দাবি, ১৯৬৯

শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী সাম্প্রতিক গণহত্যার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (নিহত ও আহত) জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবি জানান। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বেসরকারি সাহায্য কমিটি গঠন করা হইবে এবং উক্ত তহবিলের জন্য সকল মহলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হইবে।

গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গণনায়ক, শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমেদ, ছাত্রনেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাইফুদ্দিন মানিক, মোস্তফা জামাল হায়দার, মাহবুবুল হক দোলন ও মাহবুবুল্লাহ নেতাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণ প্রদান করেন। (*ইত্তেফাক*, ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)

২. গণহত্যা মানবতাবিরোধী অপরাধ, ১৯৭১

নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যার শামিল এবং সেটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধও বটে। *(বঙ্গবন্ধুর বাণী*, ২রা মার্চ ১৯৭১, পৃ. ৭৭)

৩. বুদ্ধিজীবী হত্যা, ১৯৭২

গত ২৫শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। ... একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকবাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। জাতিসংঘেরও উচিত

অবিলম্বে বাংলাদেশকে আসন দিয়ে তার ন্যায়সংগত দাবি পূরণ করা। (*বাঙালির কণ্ঠ*, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত)

৪. যুদ্ধাপরাধ, ১৯৭২

আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারব না। ওরা লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নাই, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নাই। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এত বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির আর নেই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত বেসামরিক লোক মরে নাই। (*বাঙালির কণ্ঠ*, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত)

৫. গণহত্যার বিচার হইবে, ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ নিরীহ লোককে হত্যা করিয়াছে, গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও আমাদের নারীদের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া আমাদের বহু বুদ্ধিজীবীকে তাহারা হত্যা করিয়াছে। (*সংবাদ*, ১৫ই জানুয়ারি ১৯৭২)

৬. শতকরা ৬০ জন পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে

ভাইয়েরা আমার, তাই আপনারা জানেন, যা কিছু সামান্য আমার পুলিশের লোক ছিল তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, শতকরা ৬০ জন বাঙালি পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। যা কিছু আমার সামরিক বাহিনীর লোক ছিল, তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। যা কিছু আমার শিক্ষিত লোক ছিল তাদের অনেককেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ... আমাকে ফাঁসি দেবার জন্য তারা সমস্ত কিছু ঠিক করে ফেলেছিল। ... আমার দুঃখ ছিল না, আমি মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই হুকুম দিয়েছিলাম। মৃত্যু স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাই অস্বাভাবিক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম যে আমার বাংলাদেশের মানুষকে পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠী ও দানবগোষ্ঠী দাবায়া রাখতে পারবে না। (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)

৭. রাজাকার, ১৯৭২

যারা আমার কথা শোনে না, যারা আমার হুকুম মানে না, যারা আমার আদেশ শোনে না তারা মুক্তিবাহিনী নয়, তারা বদর বাহিনী রাজাকার। আর আজকে কিছু কিছু লোক, কিছু কিছু ছেলে যারা বদর বাহিনী, রাজাকারে ছিল, ১৬ তারিখের পরে জামা বদলাইয়া মুক্তিবাহিনী হয়েছে। তারা লুটতরাজ করে, মা-বোনদের অত্যাচার করে, তারা অন্যের সম্পত্তি লুট করে, তারা গাড়ি দখল করে, তারা বাড়ি দখল করে। আমি পরিষ্কার বলে দেবার চাই এই রকমের যে অত্যাচার-অবিচার করবে আমি পুলিশ ব্যবহার করতে চাই না। পুলিশ নিয়ে আমি স্বাধীনাতা-সংগ্রাম করি নাই। আমি করেছি ৭ কোটি লোক নিয়ে। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ তাদের প্রতিরোধ কর। তাদের বাধা দাও।

আজকে তাই গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে যারা দেশকে ভালোবাসো তারা এই গুন্ডা-বদমাইশদের খতম করো। কিন্তু মনে রেখ কোনও লোক, নিরপরাধ লোকের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। যাতে আমার মুখে যেন কালি না পড়ে। (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)

৮. গণহত্যা, ১৯৭২

পশুত্বের একটা সীমা থাকা দরকার। বেহায়াপনার একটা সীমা থাকা দরকার। এত বড় বেহায়াপনা মানুষ কী করে হয় আমি জানি না। ... যুদ্ধের সময় তোমার পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী সৈনিকরা আমার বোনদের ধরে নিয়ে বাংকারে রেখেছে। হাজার হাজার মহিলাদের আমরা উদ্ধার করেছি। কত বড় পশু তোমার লোক। তোমরা মানুষ? তোমরা মানুষের বাইরে। তোমরা অসভ্য। তোমাদের গালি দেওয়ার ভাষা বাংলা ভাষায় নাই, উর্দু ভাষায় থাকতে পারে। (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ২৬শে মার্চ ১৯৭২)

৯. কোনও দেশের স্বাধীনতায় ৩০ লক্ষ মানুষ জান দেয় নাই, ১৯৭২

আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। যারা রক্ত দিয়ে গেছে তাদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। তারপর আমি আপনাদের কাছে বক্তৃতা দেই। স্বাধীনতা পেয়েছি বড় কষ্ট, বড় ত্যাগের বিনিময়ে। কোনও দেশের স্বাধীনতায় ৩০ লক্ষ লোক জান দেয় নাই। যা বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। কোনও দেশের স্বাধীনতায় ৬ কোটি লোকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয় না। আমার বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দিতে হয়েছে। মানুষ যে এত বড় পশু হতে পারে, মানুষ যে এত অযোগ্য হতে পারে, মানুষ যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে, মানুষ যে এত অমানুষ হতে পারে, তা দুনিয়ার ইতিহাসে কেউ কোনদিন দেখে নাই। যা করেছে পশ্চিম পাকিস্তানি কুকুরের দল। এত বড় পাষণ্ড। দুনিয়ার ইতিহাসে জন্মগ্রহণ করে নাই। দুধের বাচ্চা থেকে শুরু করে ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধদের পর্যন্ত গুলি করে হত্যা করেছে। আজ আমার মায়ের কোল খালি। আজ আমার গৃহহারা বস্ত্রহারা মা। আজ গ্রামে গ্রামে মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। আমার রাস্তা-ঘাট ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, আমার গুদাম পুড়িয়ে দিয়েছে, আমার কারখানা অচল করেছে, আমার বৈদেশিক মুদ্রা চুরি করেছে, আমার সোনা সব নিয়ে গেছে। (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ২৯শে মার্চ ১৯৭২)

১০. বেঈমানদের কাছে মাথানত করি নাই, ১৯৭২

আমি আমার ৭ কোটি লোকরে যাবার বেলায় কিছুই দেবার পারি নাই। তাদের হাতে আমি অস্ত্র তুলে দিবার পারি নাই। তাদের দিয়েছিলাম নীতি, তাদের দিয়েছিলাম আদর্শ, তাদের দিয়েছিলাম নির্দেশ, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে আমার পুলিশ বাহিনী, আমার পুরানো ইপিআর, আমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা, আমার বাংলাদেশের ছাত্র, যুবক, কৃষকেরা বিনা অস্ত্রে সেই পাষণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, কিন্তু বড় রক্ত দিয়ে এ স্বাধীনতা পাওয়া গেছে। এত রক্ত দুনিয়ার কোনও দেশে কোনও জাতি স্বাধীনতার জন্য দেয় নাই, যা আমার বাংলার মানুষ দিয়েছে। মানুষ যে এত পশু হতে পারে, মানুষ যে এত অসভ্য হতে পারে, মানুষ যে এত অমানুষ হতে পারে তা পশ্চিমা খান সেনাদের মতো দুনিয়ার কোথাও এ রকম পয়দা হয় নাই। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে, আমার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ঘর-বাড়িকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে, আমার ধানের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার পোর্ট আর রেললাইন

ভেঙে দিয়েছে, আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে, আমার বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়েছে, আমার মানুষকে ধরে ধরে নির্দয়ের মতো অত্যাচার করে হত্যা করেছে। মানুষ, দুনিয়ার মানুষ দেখে নাই যে কী অত্যাচার আমার দেশে করেছে। কিন্তু টিকতে পারে নাই খান সেনারা। টিকতে পারে নাই পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠী। (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ২রা এপ্রিল ১৯৭২)

১১. অসভ্য দেশঃ পশ্চিম পাকিস্তান, ১৯৭২

[ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন]

দুনিয়ার কোনও দেশ, দুনিয়ার কোনও জাতি কখনো এত রক্ত দেয়নি যা আমার বাঙালিরা দিয়েছে। ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে এ বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য। এ বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য। এমন একটা অসভ্য দেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল যাদের পশ্চিম পাকিস্তান বলা হয়। তাদের সেনাবাহিনীর লোকেরা পশুর চেয়েও অধম। তারা লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে, তারা আমার ছেলে-মেয়েকে হত্যা করেছে, তারা আমার সাবেক ইপিআরকে হত্যা করেছে, তারা আমার সামরিক বাহিনীর ভাইকে হত্যা করেছে, তারা কৃষকদের হত্যা করছে, তারা আমার ছাত্রদের হত্যা করেছে, তারা দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। হত্যা করেই শান্ত হয় নাই। তারা আমার রাস্তা-ঘাট ধ্বংস করেছে। তারা চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা আমার সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। ...

ভাইয়েরা আমার, আপনারা জানেন দেশের অবস্থা। আপনারা জানেন, কী সর্বনাশ হয়েছে এ বাংলাদেশের। ... ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। মায়ের বুক খালি হয়েছে। বোন বিধবা হয়েছে। সংসার ছারখার হয়েছে। আড়াই কোটি লোকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় পশুর দল। ...পশ্চিমারা করেছে, আর একদল বাঙালি রাজাকার, আলবদর নামে পশ্চিমাদের সঙ্গে যোগদান করে আমার বাংলার গরীব দুঃখিকে হত্যা করেছে। ...

আজ...বলেছেন, বিচার হবে না? বিচার হবে, ভালো করে বিচার হবে। যে সমস্ত পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল আমার বাংলার মা-বোনকে হত্যা করেছে এই বাংলার মাটিতে তাদের বিচার হবে। (*ওঙ্কারসমগ্র*, *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭২)

১২. স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরুন, ১৯৭২

ধরে নিয়ে ওদের বিচার করবো। তবে একটা কথা আছে, নিরাপরাধ মানুষ যেন নিজের সঙ্গে দুশমনি আছে বলে সাজা না পায়। আর যে অন্যায় করেছে তাকে আপনাদের সাজা দিতে হবে। আমি নিরাপরাধীদের গ্রেফতার করতে চাই না, তবে এখন মাঝে মাঝে কাছিম দেখেছেন? কাছিম? কাছিমের মতো মাথা বাইর করছে। ওরা আপদ-বিপদ দেখে পেটের মধ্যে মাথাটা নিয়া যায়। আর সেই দেখে মানুষ... তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা গ্রামে-গ্রামে, আমার ভাইয়েরা গ্রামে-গ্রামে পুলিশ ইনকোয়ারি করে আমি শান্তি রক্ষা করতে চাই না। আমি জনগণের সাহায্য চাই। জনগণকে নিয়ে আমি স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেছিলাম। আজ জনগণকে নিয়ে আমি সংগ্রাম করতে চাই। দেশ গড়ার সংগ্রাম এবং যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আপনারা রাজি আছেন কিনা? আপনারা রাজি আছেন? গ্রামে-গ্রামে চোর-ডাকাত ধরবেন? ধরে ধরে পুলিশে দিয়ে দিবেন। আর একটা কথা রয়ে গেল আপন বুঝ পাগলেও বোঝে। আমার দলের ভিতর কিছু কিছু লোক আছে যাদের রাতে চোরাকারবারি করে যায়। আমি বলে দিয়েছি যে বর্ডারে বর্ডারে আপনারা গণ-কমিটি গঠন করেন, দল-মত-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। আমি বাংলাদেশ রাইফেলের লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সাহায্য সহযোগিতা করবে। মনে রাখবেন এরা শুধু সিপাহী নয়, এরাও এদেশের স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতাকে রক্ষা করা জনগণের কাজ। তোমাদের কাছে এটিই আমার আবেদন এবং আবদার। (*ওঙ্কারসমগ্র*, *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭২)

১৩. যুদ্ধাপরাধ, ১৯৭২

পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আর তাহাদের আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন না। খুনি লুটেরা ও নারী ধর্ষণকারী পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তাহাদের বিচার করা হইবেই। বঙ্গবন্ধু জানান, তাহারা বাংলাদেশ যে জঘন্য ও অমানুষিক কাজ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পাকিস্তানি বলিয়া দাবি না করার জন্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। বিশ্ব আজ তাহাদের জঘন্য অপরাধের বিষয় জানিয়াছে। (*ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২)

১৪. পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা, ১৯৭২

আমাদের দিক দিয়ে সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং চেষ্টা হচ্ছে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য। এই রকমের অনেক প্রশ্নই আছে এবং এ সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি কেউই করছে না। সরকার বারবার বলেছে, সভা-সমিতিতে বলেছে, ... ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি সমস্ত দেশে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যাতে তারা পাকিস্তানের সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন এবং আমার লোক যাতে ফেরত দেয় এও বলেছি যে তাদের যারা এখানে থাকবার চায় না তাদেরও আমি ফেরত দিতে রাজি আছি, তবে যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের বিচার বাংলার মাটিতে হবে। এটা নিয়ে পাকিস্তান খেলছেন। কিন্তু আমার যারা পশ্চিম পাকিস্তানে আছে তারা যুদ্ধাপরাধী নয়। তারা সেখানে কাজ করতে ছিলেন, তাদের সঙ্গে এদের একভাবে বিচার করা চলে না। সে জন্যই আমরা দাবি করেছি যে আমাদের লোক যারা আছে ফেরত দেও তোমাদের যারা এই বাংলাদেশে আছে আমরা ফেরত দিচ্ছি, কিন্তু যুদ্ধাপরাধী জঘন্য যুদ্ধ অপরাধী যারা, যারা এদেশে পাশবিক অত্যাচার করেছে, লুট করেছে, হত্যা করেছে এবং যারা দুনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ল/ আইন মানে নাই তাদের এখানে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার হবে এবং আমি আশা করি মেম্বার সাহেবদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে প্রস্তাব আনার আগে পার্টির সাথে আলোচনা করেই প্রস্তাব আনবেন। ভবিষ্যতে এটাই আশা করি, এটাই নিয়ম। না হলে পার্টির শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।

আমি আশা করি স্পিকার সাহেব, আমাদের আজকের এজেন্ডা এখানেই শেষ। (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ১০ই এপ্রিল ১৯৭২, ঢাকা)

১৫. সবুজ বাংলাদেশকে লাল করা, ১৯৭২

তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হামলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্বর ইয়াহিয়ার কাপুরুষ খান সেনারা অতর্কিতে এ দেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেছিল। তারা এমনকি মায়ের কোলের শিশুদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশ বর্বর খান সেনারা যে পাশবিক ও নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে তা নজিরবিহীন। ... এমন দলিলও হাতে এসেছে যাতে দেখা গেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের এ দেশে বেপরোয়া হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। (*ইত্তেফাক*, ১১ই এপ্রিল ১৯৭২)

১৬. যুদ্ধাপরাধ, ১৯৭২

শেখ মুজিবুর রহমান বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ, নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলেন, ইহারা ইসলামের নামে যে অত্যাচার, নৃশংসতা, হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা চালাইয়াছে, বিশ্ব-মানবতার ইতিহাসে ইহার কোন নজির নাই। তাহারা কি করিয়া নিজেদের মুসলমান বলিয়া দাবী করে তাহা ভাবিয়া পান না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, ইসলাম কখনই ধর্ষণ ও গণহত্যা অনুমোদন করে নাই। বর্বর পাকিস্তানিরা ২ মাসের শিশুকেও নির্মমভাবে হত্যা করিতে ছাড়ে নাই। প্রধানমন্ত্রী জানান যে, পাকিস্তানী পশু ও বর্বররা বাংলাদেশে কমপক্ষে ২ লক্ষ মহিলার ইজ্জতহানি করিয়াছে। তাহাদের নিন্দা করার কোন ভাষা নাই। (*ইত্তেফাক*, ২৯শে এপ্রিল ১৯৭২)

১৭. পাক সৈন্যদের কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না, ১৯৭২

সামরিক বিভাগের কর্মচারীসহ পাকিস্তানে আটক সমস্ত বাঙালি অবশ্যই দেশে ফিরিয়া আসিবে। গত বৃহস্পতিবার সিরাতুননবী জনসভায় ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কথা বলেন। ভুট্টোকে সতর্ক করিয়া তিনি বলেন, নিরীহ বাঙালিদিগকে আটকাইয়া রাখিবার কোন অধিকার তাহার নাই। দৃঢ়আশা পোষণ করিয়া তিনি বলেন, 'ইনশাল্লাহ আমার লোক ফিরিয়া আসিবে।'

পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে যে জঘন্যতম অপরাধ করিয়াছে বাঙালি সেনাবাহিনীর লোক ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারী সেইখানে তেমন কিছুই অপরাধ করে নাই। তবু কেন বাঙালিদিগকে আটক রাখা হইল, কেনইবা তাহাদিগকে দেশে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না? তার সঠিক জবাব দিবার জন্য বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে প্রশ্ন করেন। ...

বঙ্গবন্ধু সুনিশ্চিত করিয়া বলেন যে, বাঙালিরা ফিরিয়া আসিবে। তিনি বলেন, মনুষ্য-কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বর পাক সৈন্যদের ফিরাইয়া নিবার দাবি ভুট্টো কিছুতেই করিতে পারে না; কারণ এরা এত জঘন্য অপরাধে অপরাধী যে, তাহাদেরকে মানবসন্তান বলিয়া ধারণা করা যায় না। একটি ১২/ ১৩ বৎসরের বালিকার উপর কিরূপে ৩ মাস ধরিয়া জনৈক ক্যাপ্টেন ও তাহার ২৫ জন সহগামী ঢাকা সেনানিবাসে দৈহিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, তার এক করুণ বর্ণনা দিয়া তিনি বলেন, এই নরপশুদের কি ক্ষমা করা যায়? তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, এই ধরনের বহু হতভাগ্য মেয়ের সর্বনাশ ঘটাইয়াছে তথাকথিত ইসলামদরদী দল– জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রসংঘ, আলবদর প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকের দল। – বাসস (*ইত্তেফাক*, ২৯ই এপ্রিল ১৯৭২)

১৮. পাকিস্তানিরা ১০ হাজার গুণ বেশি অন্যায় করেছে, ১৯৭২

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জালেমরা, যারা অস্ত্র দিয়ে বাহাদুরি দেখাইয়া বড় বড় তকমা লাগাইয়া, এখানে বহুত তকমা লাগাইত– এখানে এক স্টার, দুই স্টার, তিন স্টার, চার স্টার, মাথার মধ্যে ক্যাপ লাগাইয়া লাগাইয়া আমার বাংলাদেশের মানুষরে মারে। আমার পয়সা দিয়া। ঐ তকমাওয়ালাদের একবার আমি ঢাকাতে আনবো। আইনা আর কিছু করবো না। বিচার করবো। তোমাদের মতো আমি বিনা বিচারে গুলি কইরা মারিবো না। আমি বিচার করিবো। বিচারে যে সাজা হয়, সেই সাজা তোমাদের ভোগ করতে হবে। ... এদের বিচার এখানে হবে ইনশাল্লাহ। ... তোমরা কী করতা যে তোমাদের দেশের রাস্তা ঘাট যানবাহন, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে ছাড়খাড় করে দিত। তোমরা তো নুরেমবার্গ ট্রায়াল করেছিলা। এরা নুরেমবার্গ ট্রায়াল এ জার্মানিতে ফ্যাসিস্টরা করেছে তার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি অন্যায় করেছে বাংলার বুকে। (*ওঙ্কারসমগ্র*, *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ১০ই মে ১৯৭২, পাবনা)

১৯. বাংলার মানুষকে ভালোবাসি, ১৯৭২

[বঙ্গবন্ধু পাবনায় জনসভায় ভাষণ দেন]

আমার সহকর্মী আমির উদ্দিনকে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। আমার দুধের বাচ্চাদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। আমার গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। আমার খাবার গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার রাস্তাঘাট ভেঙে দিয়েছে। আমার রেললাইন নষ্ট করেছে। আমার পোর্টের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। আমার ফেরিগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। আমার ট্রাক-বাসগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি করেছে। গ্রাম বাংলাকে ছারখার করেছে। যেদিকে চাই সেদিকে দেখি শুধু গৃহহারার আর্তনাদ। ... এই নরপশুরা আমার বাংলার সম্পদ নিয়ে খুশি হয় নাই, আমার গ্রামকে গ্রাম ছারখার করে দিয়ে গেছে। এরা মানুষ না, এরা অমানুষ। অমানুষ বললেও ভুল হবে। ... (*ওঙ্কারসমগ্র*, *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ১০ই মে ১৯৭২, পাবনা)

২০. ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে, ১৯৭২

[সিলেটের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে এই ভাষণ দেন]

দেশের অবস্থা আপনারা ভালো করে জানেন। পাকিস্তানের বর্বর সামরিক বাহিনী আমার বাংলাদেশকে খতম করে দিয়ে গেছে। ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ বললে ভুল হবে। কোটি কোটি ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। এক কোটি লোক দেশের মায়া ত্যাগ করে জীবনের মায়ায় ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। আর যারা ছিলেন, তারা অনেক কষ্টে দিন যাপন করেছেন। দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। যারা আমাদের ক্যাম্পে এসেছে। রেললাইন, রাস্তা, লঞ্চ, ট্রাক, বাস, পোর্ট, শতকরা ৫০/৬০ ভাগ ধ্বংস করে দিয়ে

গেছে। চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। কারেন্সি নোট জ্বালায়ে দিয়ে গেছে। এত বড় পাষণ্ড দুনিয়ার ইতিহাস দেখা যায় নাই। যা পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীরা করেছে আমার দেশে। ...আমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা, আমার পুলিশ, আমার বিডিআর, আমার ছাত্র, আমার যুবক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার কৃষক, আমার শ্রমিক ভাইরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। আমি বলে গিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ তারিখে আমি বলে দিয়েছিলাম যে, আমাদের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি জানতাম, যে জীবনেও বোধ হয় আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসতে পারবো না। যখন গ্রেফতার করে আমাকে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যায়। কিন্তু আমি ফিরে এসেছি। আপনারা দোয়া করেছেন। আপনারা রক্ত দিয়েছেন। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। (*ওঙ্কারসমগ্র, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি,* ২৮শে জুন ১৯৭২, সিলেট)

২১. এতোবড় ফেরাউন আর জন্মগ্রহণ করেনি, ১৯৭২

[কুষ্টিয়ায় বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন]

২৪ বৎসরের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। ২৪ বৎসরের ইতিহাস রক্তের ইতিহাস, ২৪ বৎসরের ইতিহাস অত্যাচার, নিপীড়নের ইতিহাস। পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী এই বাংলাদেশ থেকে ২৪ বছরে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। বারবার মোকাবেলা করেছিল। বারবার রক্ত দিয়েছে বাংলার মানুষ, বাংলার ছেলেরা বারবার জেল খেটেছে। বারবার বাংলার মানুষ অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু শেষ যুদ্ধ হয়। ২৫শে মার্চে শুরু হয়। সে ইতিহাস কুষ্টিয়াবাসীরা ভালো করে জানেন। সে ইতিহাস বাংলার মানুষ ভালো করে জানেন। শুধু জানেন না, তারা যে অত্যাচার সহ্য করেছেন নিষ্ঠুর পাকবাহিনী ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের নমরুদ বাহিনী, আমার লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষকে গৃহহারা, সর্বহারা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে বিধবা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছে। ...লড়েছিল বাংলার যুবক, লড়েছিল বাংলার শ্রমিক, লড়েছিল বাংলার বুদ্ধিজীবী, লড়েছিল বাংলার পুলিশ, লড়েছিল বাংলার বিডিআর, লড়েছিল বাংলার সামরিক বাহিনীর ছেলেরা। তাদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে মোকাবেলা করেছিল শত্রুকে। আমি যাবার বেলায় বাংলার মানুষের কাছে দেবার পারি নাই কিছুই। শুধু ২৫ তারিখ রাত্রে যখন সামরিক বাহিনীর লোকেরা আমার ওপর মেশিনগান মারতে শুরু করল, সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম, এই আমার জীবনের শেষ। তাই আমি টেলিফোন করে খবর দিলাম আমার বিডিআর হেড কোয়ার্টার চট্টগ্রামে। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, আমার জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হতে না পারে, বাংলার ঘরে ঘরে জানিয়ে দাও, যে পর্যন্ত এই পৈশাচিক বাহিনী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত না হবে, যে পর্যন্ত না সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা না পাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। যুদ্ধ কোরো জীবন দাও, নমরুদদের জ্বালিয়ে দাও। আমার শতকরা পঞ্চাশ জন সিপাহীকে হত্যা করা হয়েছে, আমার বিডিআরকে হত্যা করা হয়েছে। আমার ছেলেদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু টিকতে পারে নাই নমরুদের দল। ...

সুখে থাকো ভুট্টো সাহেব সুখে থাকো। তোমার ভাই বোনদের নিয়ে সুখে থাকো, আমি আশীর্বাদ করি। (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি,* ১৯শে জুলাই ১৯৭২)

২২. দালালদের আর স্থান নেই, ১৯৭২

[বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জের আদমজিনগরে এক জনসভায় এই ভাষণ দেন]

যখনই আমি ডাক দিয়েছি এ অঞ্চলের ভাইয়েরা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। দেশের মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ... আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেক রক্তের বিনিময়ে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন জীবন দিয়েছে। বোনেরা আমার বিধবা হয়েছে। ভাইয়েরা আমার পুত্রহারা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গৃহহারা সর্বহারার আর্তনাদ বাংলার বুকের মধ্যে আজও বাজছে। এ জন্য এই পৈশাচিক নরপশুর দল পাকিস্তানের দোসরবৃত্তি, সামরিক বাহিনীর লোকেরা আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষের, নিরাপরাধ লোকজনকে হত্যা করেছে। দুনিয়ার কোনও দেশে এ রকম দেখা যায় নাই। যা পাকিস্তানের অমানুষগুলো করে গেছে। ... (*বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি,* ১৯শে জুলাই ১৯৭২)

২৩. গণহত্যা, ১৯৭২

...শুধু তারা মানুষ হত্যা করেছে তা নয় আমার পুলিশকে হত্যা করেছে, আমার আনসারদের হত্যা করেছে, আমার কৃষকদের হত্যা করেছে, আমার ছাত্রদের হত্যা করেছে, আমার শ্রমিকদের হত্যা করেছে, রাস্তাঘাট ধ্বংস করেছে, রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে, আমার ব্রিজ ভেঙে দিয়েছে, আমার ধানের ক্ষেত জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গেছে। ...বাধ্য হয়ে আমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষের কাছে অস্ত্র। আমি যদি না বলি, বাংলার মানুষ অস্ত্র দেবে না। (*ওঙ্কারসমগ্র, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি,* ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭২)

২৪. বাংলার মাটিতে বিচার হবে, ১৯৭৩

[টাঙ্গাইলে জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন]

আমি যখন বন্দী ছিলাম পাকিস্তানে তখন আপনারা টাঙ্গাইলবাসী ভাইয়েরা টাঙ্গাইলবাসীর জনসাধারণ বোনেরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার দেশের ত্রিশ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার দেশের মা-বোনের বুক খালি করেছে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার মায়ের কোল খালি করেছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজও কাঁদে। ছেলেহারা মায়ের আর্তনাদ, স্বামীহারা বোনের আর্তনাদ, পুত্রহারা বাপের আর্তনাদ আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে চলছে। কিন্তু বাঙালিরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাঙালি জাতিকে কেউ আর দাবায় রাখতে পারবে না। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতি একদিন স্বাধীন হবে ইনশাল্লাহ। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ... তোমাদের খেলা আমরা জানি। তোমরা আজকে বলছ যে যুদ্ধ বন্দীদের বিচার কোরো না। যারা আমার ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, যারা আমার দুঃখি মা-বোনকে হত্যা করেছে, যারা আমার গ্রামকে গ্রাম ছারখার করেছে, যারা আমার ১ কোটি লোককে দেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে যেতে বাধ্য করেছিল তাদের বিচার ইনশাল্লাহ যদি আমি বেঁচে থাকি এই বাংলার মাটিতে তাদের হবে কেউ ঠেকাতে পারবে না। ...আজ যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দেয়ার জন্য আপনারা

কান্দেন। যারা কথা বলেন আমি তাদের কাছ থেকে জানতে চাই আমার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে কি অন্যায় করেছিল, আমার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে চাকরি করছিল, ব্যবসা করছিল। তাদের রাখার অধিকার তাদেরকে দিয়েছে? মনুষত্ব দুনিয়ায় নাই। আমি ছোট রাষ্ট্র হতে পারি। অত ছোট রাষ্ট্র বাংলাদেশ নয়। আমি আমার রাষ্ট্র দুনিয়ার অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমার লোক সংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। আমার মানুষ সংঘবদ্ধ। (*ওঙ্কারসমগ্র, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, টাঙ্গাইল)

২৫. ওরা মানুষ না, অমানুষ, ১৯৭৩

ওরা মানুষ না, ওরা অমানুষ। কী করে যে আমার ছেলেদের হত্যা করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এমন ঘাট নাই যেখানে আমার শহিদের কবর নাই। কত লোক কত মায়ের কোল খালি করেছে। যখন বোনেরা এসে আমার কাছে কাঁদে কোথায় আমার স্বামী, যখন বাপ এসে আমার কাছে কাঁদে কোথায় আমার ছেলে, যখন ভাই এসে আমার কাছে বলে কোথায় আমার ভাই? একজন লোকের ৫/৬ ছেলে ৪টা ছেলেকে হত্যা করেছে। এমনি করে যে কত মায়ের বুক খালি করে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের পশুরা তা আমি কল্পনা করতেও পারি না। ওরা যে এত অমানুষ, ওরা যে এত পশু, ওরা যে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ, ওরা যে নমরুদের চেয়েও খারাপ তা আমরা জানতাম না। দুঃখ হয় এই বাংলার বুকে যখন বারবার যুদ্ধ করেছি পশ্চিমাদের সাথে একদল লোক বর্বর পশ্চিমাদের সাথে হাত মিলিয়েছে মন্ত্রিত্বের লোভে। (*ওঙ্কারসমগ্র, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, সুনামগঞ্জ)

২৬. দুধের বাচ্চাদের হত্যা করেছে, ১৯৭৩

[চাঁদপুরে এই ভাষণ দেন]

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, সেই অত্যাচারের কাহিনি আমি নাইবা বললাম, আপনারা নিজেরাই তা জানেন। কেমন করে দুধের বাচ্চাদের হত্যা করেছে, কেমন করে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কেমন করে ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। ... এমনকি যাবার বেলায় আমার বুদ্ধিজীবীদের পর্যন্ত হত্যা করেছে, পোর্ট নষ্ট করেছে, রেললাইন ধ্বংস করেছে, স্টিমার জাহাজ ডুবায়ে দিয়েছে। এমন কোনও কাজ করে নাই, এমন কোনও জিনিস রেখে যায় নাই যা নিয়ে সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁচানো যায়।

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার, স্বাধীনতায় এত রক্ত বাংলার মানুষ যা দিয়েছে দুনিয়ার কেউ তা দেয় নাই। স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা বড় রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। ...

... আজও আমার দেশের মা-বোন কাপড় পায় না, আজও আমার দেশের মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা। স্বাধীনতা পেয়েছি বড় রক্তের বিনিময়ে। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমন কষ্টকর। (*ওঙ্কারসমগ্র, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, চাঁদপুর)

২৭. ওরা মানুষ নামের অধম, ১৯৭৩

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, দুঃখের সাথে বলতে হয়, ওরা মানুষ না। ওরা মানুষ নামের অধম। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না কোথাও যে দুধের বাচ্চাকে কেউ হত্যা করে। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না কোথাও যে বৃদ্ধ মহিলাকে কেউ হত্যা করে। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না যে এদেশের বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করে। যেখান দিয়ে গিয়েছে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেকে হত্যা করেছে। (*ওঙ্কারসমগ্র, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, সিরাজগঞ্জ)

২৮. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে, ১৯৭৩

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সুদৃঢ় কণ্ঠে বলেন যে, খুব শীঘ্রই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

জনৈক বিদেশি সাংবাদিক দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন: আপনাদিগকে তো পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে শুনি না। তিনি বলেন, কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা তো আটক বাঙালিদের দেখাশোনা করে না। আটক বাঙালিগণ বন্দি শিবিরে অনাহারে-অনিদ্রায় এক দুঃসহ জীবনযাপন করিতেছে। অথচ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী অবাঙালিদের আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতি যথাযথ ভাবে দেখাশোনা করিতেছে। (*ইত্তেফাক*, ৯ই মার্চ ১৯৭৩)

২৯. যুদ্ধবন্দী, ১৯৭৩

বঙ্গবন্ধু বলেন, এইসব উস্কানি সত্ত্বেও মানবিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য গত এপ্রিল মাসে আমরা ভারতের সঙ্গে একত্রে একটি বড় রকমের পদক্ষেপ গ্রহণের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বীকৃতির প্রশ্ন আলাদা রাখিয়াও আমরা একযোগে পাকিস্তানে আটক সমস্ত বাঙালি, বাংলাদেশে অবস্থানরত সমস্ত পাকিস্তানি এবং যাহাদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ রহিয়াছে এইরকম ১ শত ৯৫ জন ব্যতীত ৯২ হাজার যুদ্ধবন্দী ও আটক অসামরিক ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণের জন্য আমাদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করি। (*ইত্তেফাক*, ৪ঠা আগস্ট ১৯৭৩)

৩০. যুদ্ধাপরাধী, ১৯৭৫

প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ যুদ্ধ-অপরাধীদের পর্যন্ত ক্ষমা করিয়া দিয়াছে। উপমহাদেশে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের নূতন অধ্যায় সূচনা করার মানসেই বাংলাদেশ এই উদার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। (*ইত্তেফাক*, ৫ই মে ১৯৭৫)

ড. মুনতাসীর মামুন: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইতিহাসবিদ, সভাপতি, ১৯৭১: জেনোসাইড-টর্চার আর্কাইভ মিউজিয়াম ট্রাস্ট, dr.muntassirmamoon@gmail.com

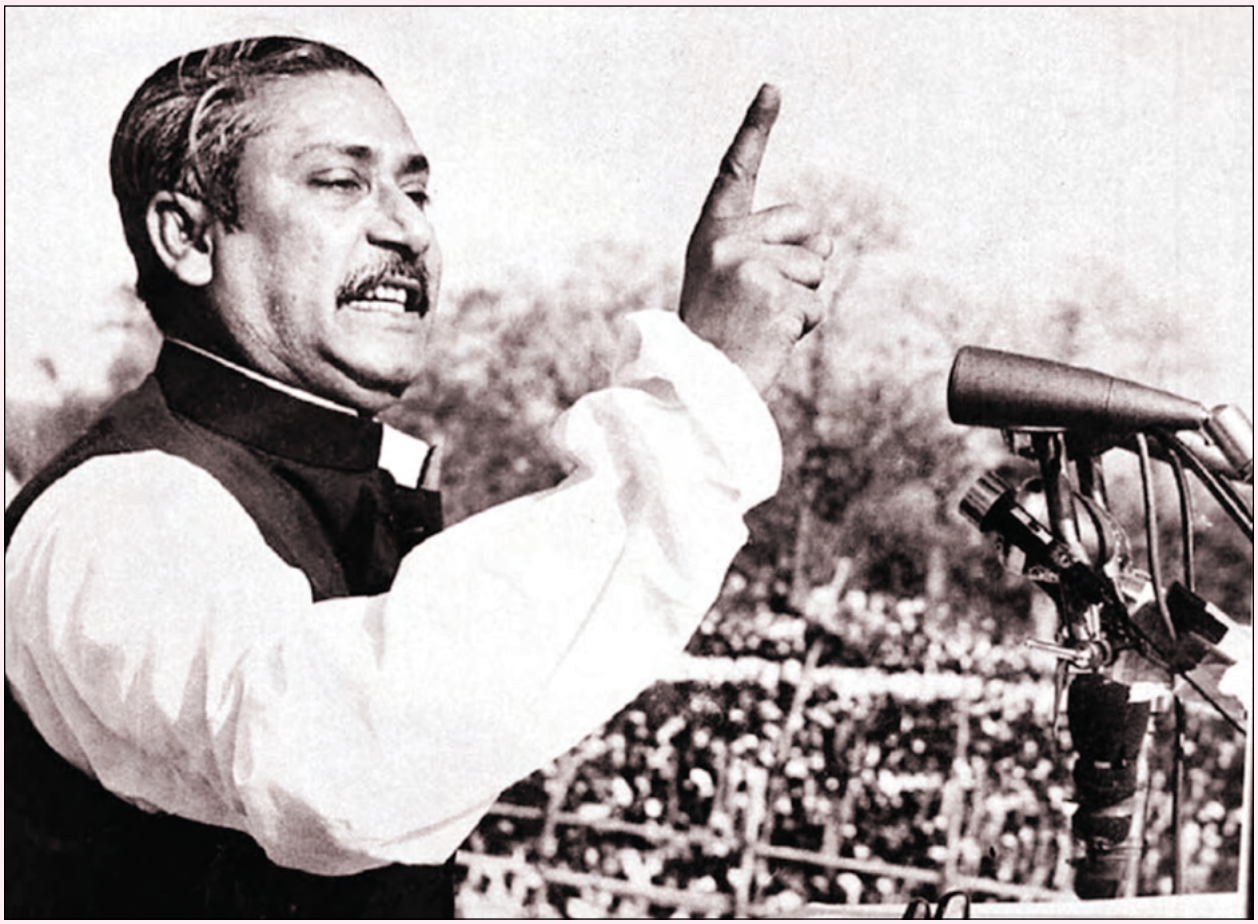

মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, এসডিজি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

মফিদুল হক

২০১৭ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের স্বীকৃতি প্রদান ছিল ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়ার এক ভিন্নতর দৃষ্টান্ত। ঢাকা মহানগরীর রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের বাণী বুঝে নিতে দেশের মানুষ ভুল করেনি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসজুড়ে এই ভাষণ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মানুষকে জুগিয়েছে পথের দিশা। পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের মুখোমুখি বাঙালি যে প্রতিরোধ গড়তে কালবিলম্ব করেনি তার পেছনেও ছিল এই ভাষণ। জাতিকে স্বাধীনতার বাণীমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। তবে ৭ই মার্চের ভাষণকে আরও গভীর ও বিস্তারিতভাবে দেখার রয়েছে এবং তারই প্রতিফলন পাওয়া গেল ইউনেস্কোর স্বীকৃতি ও ঘোষণায়। আমার জীবনের বড়ো সৌভাগ্য যে, ৭ই মার্চের ভাষণের 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হিসেবে স্বীকৃতির আবেদনের মুসাবিদার কাজ সম্পাদন করতে পেরেছিলাম। কাকতালীয়ভাবে এই সুযোগ মিলেছিল এবং এই কাজের সুবাদে প্যারিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম, একই সাথে যিনি ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি, তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং উভয়ে মিলে আবেদনপত্র ইউনেস্কোতে জমা দেওয়া হয়। ৭ই মার্চের ভাষণের পর্যালোচনাকালে ইউনেস্কোর মনোনয়ন কমিটির প্রধানের জিজ্ঞাসা ছিল এই ভাষণের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য ইতিহাসের উত্তেজনাপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এই ভাষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, তবে বিশ্বমানবের জন্য এর প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য বুঝে নেওয়া ছিল জরুরি। তৃতীয় বিশ্বের পদানত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আলোকে ৭ই মার্চের ভাষণ বিবেচনায় ইউনেস্কোও আগ্রহী ছিল এবং উদারবাদী মুক্ত অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার জাগরণ ও রাষ্ট্রসত্তা প্রতিষ্ঠার আলোকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ স্বীকৃতি অর্জন করে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হিসেবে। ইউনেস্কোর ঘোষণায় বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় এই ভাষণের প্রাসঙ্গিকতা তারা মেলে ধরেছেন। ঘোষণায় বলা হয়, 'এই ভাষণ কার্যকরভাবে প্রদর্শন করে কীভাবে উপনিবেশ-উত্তর সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক ভাষাগত অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে বিযুক্ত করে দেয়। এই ভাষণ কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।'

স্পষ্টতই ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বৃহত্তর পটভূমিকায় বিচার করেছে এবং জাতীয় অধিকার-ভিত্তিক সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠার আলোকে ভাষণের মূল্যায়ন করেছে। এমনি মূল্যায়নের আরেক পর্ব উন্মোচিত হয়েছে ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক প্রকাশনায় যা আমাদের দৃষ্টি দাবি রাখে। ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র, তথ্য, প্রামাণ্য সামগ্রী সংরক্ষণ উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য প্রজাতান্ত্রিক কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ডকুমেটারি হেরিটেজ (আইসিডিএইচ)। ইউনেস্কোর এই সংস্থা ২০২১ সালে একটি সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেছে নবীন প্রজন্মের কাছে বিভিন্ন 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর পরিচয় তুলে ধরতে। 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফিল্ড উইথ কালার' গ্রন্থটি নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যবহ। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি এসডিজি বা দৃঢ়ভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ত করে দশটি 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' দলিল এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সাথে কোরীয় শিল্পী অঙ্কিত রঙিন ঝলমলে ছবি যুক্ত হয়েছে। আজকের দিনের নবীনরা যেন বিশ্বমানবের সুকৃতির ধারণা পেতে পারে এবং তাদের ভবিষ্যতের সুন্দর জীবন-নির্মাণের আলোকে তা অনুধাবন করে– এমন এক মহৎ লক্ষ্য নিয়ে গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সতেরোটি এসডিজি লক্ষ্যসমূহের মধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে দশটি এবং মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড-এর তাৎপর্যপূর্ণ দলিলের আলোকে সংশ্লিষ্ট এসডিজি লক্ষ্যপূরণে ইতিহাসের শিক্ষা ও চিত্রসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডের এমন দশটি প্রামাণ্য দলিলের মধ্যে রয়েছে কোরিয়ায় বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে আত্মপ্রত্যয়, সমাজশক্তি ও সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত কর্মযজ্ঞের নেতৃত্বদানে সাইমাল উনডং-এর ভূমিকা ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি। এসডিজির প্রথম লক্ষ্য দারিদ্র্য নিরসনের সঙ্গে মিলিয়ে এইসব দলিলের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের মালির টিমবাকটু গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম জ্ঞানসাধক আবদুল্লাহ ডান ফোডির পাণ্ডুলিপি স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বমানবের ঐতিহ্য হিসেবে। এই গ্রন্থে ধর্মের সঙ্গে দেহমনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সকল মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকারের আলোকে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এসডিজির তৃতীয় লক্ষ্য, সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এই দলিলের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তিন পাতা জুড়ে চিত্রমালা ও দুই পাতা লেখা মিলিয়ে চিত্তাকর্ষকভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থ প্রণয়নে বর্তমান লেখকের সম্পৃক্তির সুযোগ হয়েছিল এবং সহসম্পাদক হিসেবে প্রয়োজনীয় উপাদানের জোগান দেওয়া হয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণকে আইসিডিএইচ যুক্ত করেছিল এসডিজির দশম লক্ষ্যের সঙ্গে, যা ছিল বৈষম্য দূরীকরণ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পদানত ও পীড়নকারী সম্পর্ক পাল্টে দেওয়ার আহ্বানের পাশাপাশি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে সাম্য ও সমন্বিত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। গ্রন্থভুক্ত দশটি মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালে প্রদত্ত ভাষণ ছিল একটি রাজনৈতিক দলিল এবং অপর প্রামাণ্য রাজনৈতিক দলিল ছিল ১৭৮৯ সালের

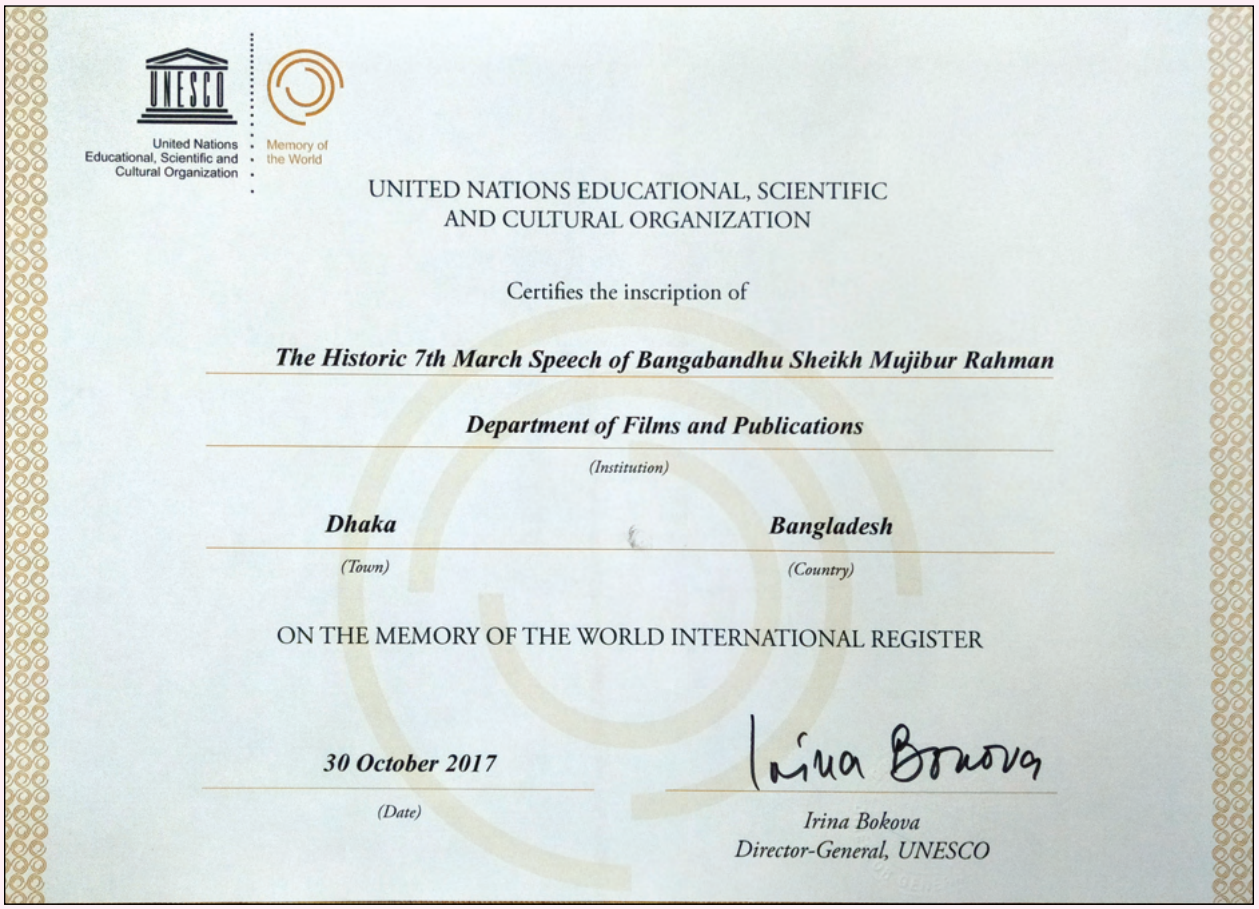
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Memory of the World

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Department of Films and Publications

(Institution)

Dhaka — *(Town)*

Bangladesh — *(Country)*

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017

(Date)

Irina Bokova

Irina Bokova
Director-General, UNESCO

ফরাসি বিপ্লবের সকল মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার সংবলিত ঘোষণা। ষোড়শ এসডিজি লক্ষ্য, তথা শান্তি, ন্যায় ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের বাণী।

আজকের বিশ্বসম্প্রদায়ের অভিন্ন অঙ্গীকার এসডিজির সঙ্গে দূর অতীত ও নিকট অতীতের দুই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার যোগসূত্র আমাদের বিস্মিত করে। সেই সাথে এই উপলব্ধিও তো আমরা পাই বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ৭ই মার্চ প্রদত্ত ভাষণ ইতিহাসে কোন অক্ষয় অবদান রচনা করেছে। ফরাসি বিপ্লবে মানুষের অধিকারের ঘোষণা আর পদানত জাতির মুক্তির অধিকার সংবলিত ৭ই মার্চের ভাষণ তাই মানবসুকৃতির একই মালার দুটি ফুল হিসেবে গ্রথিত হয়ে যায়। কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের ব্যবধান ঘুচিয়ে এই মিলন এখানে যোগ্য-সম্পৃক্তি অর্জন করেছে যা সভ্যতার অগ্রগমনের জন্য আজকের দিনে অর্জন করেছে প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হতে পারে যোগসূত্রহীন, ইতিহাস বিচারে তা এভাবেই হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক।

এখানে ইতিহাসের আরেক তথ্য আমরা বিবেচনায় নিতে পারি। শেখ মুজিব ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন সেই পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থ *কারাগারের রোজনামচা* থেকে। বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমে জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করে পথের দিশা জুগিয়েছিলেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে এবং মুক্তির কোনো সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তাঁকে গ্রেপ্তার করে একের পর এক মামলা দায়ের করে চিরতরে কারাবন্দি করার পরিকল্পনা আঁটে সরকার। বাস্তিল দিবসে ১৪ই জুলাই ১৯৬৬ কারাগারে বসে রোজনামচায় তিনি স্মরণ করেছেন বাস্তিল দিবসে ফরাসি বিপ্লবের অবদান। তিনি লিখেছেন :

> ১৪ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার : ১৭৮৯ সালের ১২ই জুলাই ফরাসি দেশে শুরু হয় বিপ্লব। প্যারি নগরীর জনসাধারণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করে। ১৪ই জুলাই বাস্তিল কারাগার ভেঙ্গে রাজবন্দিদের মুক্ত করে এবং রাজতন্ত্র ধ্বংস করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৭ বৎসর পরেও এই দিনটি শুধু ফ্রান্সের জনসাধারণই শ্রদ্ধার সাথে উদ্‌যাপন করে না, দুনিয়ার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।
>
> তাই কারাগারের এই নির্জন কুঠিতে বসে আমি সালাম জানাই সেই আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের, যারা প্যারি শহরে গণতন্ত্রের পতাকা উড়িয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ দুনিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণ এই দিনটার কথা কোনোদিনই ভুলতে পারে না।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি বাঙালির নেতা ফরাসি বিপ্লবের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন তখন কে জানতো পরবর্তী ইতিহাসের গতিধারায় ব্যক্তি মুজিবের অবদান ও ফরাসি বিপ্লব পাল্টে যাওয়া পৃথিবীতে নতুন বিবেচনায় আবার চিন্তা ও কর্মের ঐক্য ফিরে পাবে।

ইতিহাস স্মরণে রেখে আমরা যদি তাকাই ভবিষ্যতের দিকে তবে ৭ই মার্চের ভাষণের সমকালীন ও ভবিষ্যৎমুখী তাৎপর্য নতুনভাবে খুঁজে পাই। 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফিল্ড উইথ কালার' গ্রন্থে ৭ই মার্চের ভাষণের যে সবিস্তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়। ভাষণের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে,

Today, Mujib's speech lasts as a universal record delivering strength and a spirit of cohesion. In a world where many societies are getting torn apart by various divisions, the message of a harmonious, multi-religious society holds universal significance. The speech is nationally recognized as the most significant event for establishing Bangladesh and is educated through the national curriculum. The recorded speech and its audiovisual version are known by every Bangladesh student, with the image of Sheikh Mujib delivering the speech lasting as an iconic national symbol. The inscription of the speech as Memory of the World has given new impetus to various educational, artistic, research, and projection acts highlighting its content.

উপসংহারে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং আজকের দিনে ভাষণ বিষয়ে ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাধারা ব্যাখ্যা করে *The Emergence of Bangladesh and the Speech Today* – তে বলা হয়েছে :

The world focused its attention on Mujib as he addressed his speech in Dhaka on 7th March. International press members rushed to the capital city, and diplomats engaged in the behind scene talk. With the speech capturing a pivotal moment to the international society, the later outbreak of the genocide and war assembled global solidarity to confront inhuman actions and protect fundamental human rights. Tragic but fierce movements were compensated with the independent state of Bangladesh in December 1971, with adopting a constitution the following year that reflects many internationally treasured values.

ইউনেস্কোর প্রকাশনা নতুন আলোকে ৭ই মার্চের ভাষণ ও ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান বুঝিয়ে দেয় আমাদের। আমরা আমাদের নিজেদের ইতিহাস নিয়ে চর্চা ও মূল্যায়নে যে ঘাটতির পরিচয় দিয়ে চলেছি, বৈশ্বিক পটভূমিকায় বাঙালির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, তার তাৎপর্য এবং মুক্তির উদ্‌গাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বুঝতে মূল্যায়ন করতে এখনও পুরোপুরি যে সক্ষম হইনি, ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্বমানবের স্মৃতিসম্পদ হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি এবং আইসিডিএইচের প্রকাশনা সেই বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়। আগামী দিনের নাগরিকদের জন্য ইউনেস্কোর প্রকাশনা আরও গভীরভাবে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বমানবের যুক্ততা মেলে ধরেছে। আশা করি, 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফিল্ড উইথ কালার' নতুনভাবে ইতিহাস বিচারের পথ আমাদের সামনে খুলে দেবে।

পাদটীকা : *মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আলোচ্য গ্রন্থের বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ করেছে।*

মফিদুল হক: লেখক, গবেষক ও ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর mofidul_hoque@yahoo.com

১৯৭১-এর গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন এবং একটি অপ্রকাশিত দলিল

হারুন রশীদ

বিশ শতকের ইতিহাস কলঙ্কিত করেছিল যেসব নৃশংসতা তার অন্যতম হচ্ছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা। ৯ মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা হত্যা করেছে ৩০ লাখ মানুষ। ধর্ষণ করেছে দুই লাখের বেশি বাঙালি নারীকে। ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেছে বাংলাদেশের সম্পদ, স্থাপনা ও ঘরবাড়ি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে এত ব্যাপক গণহত্যা আর ঘটেনি।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর কাছে পরাজয়ের পর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে এক তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস. আনোয়ারুল হক, পাঞ্জাব ও সিন্ধু হাইকোর্টের বিচারপতি তুফায়েল আলী আবিদুর রহমান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আবদুল কাদির। কমিশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সহকারী রেজিস্টার এম. এ. লতিফ। কমিশনের দায়িত্ব ছিল সেই পরিস্থিতি তলিয়ে দেখা, যেখানে বাংলাদেশে, পাকিস্তানের ভাষায় ইস্টার্ন কমান্ডে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে এ কমিশন গঠন করা হয়নি। বরং গণহত্যা, ধর্ষণ এবং লুণ্ঠনকে আড়াল করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নেতৃত্বকে যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য দায়বদ্ধ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল ঐ কমিশন।

কমিশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে নিয়োজিত পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তারা রেখেঢেকে যা বলেছে তা থেকেও ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তা কোনোভাবেই আড়াল করা যায়নি। পাকিস্তান সরকার কিন্তু হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে ভারতের *ইন্ডিয়া টুডে* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কমিশনের সম্পূরক রিপোর্ট। আর সে রিপোর্ট নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশ করেছে *একাত্তরের গণহত্যার দলিল*। *ইন্ডিয়া টুডে* পত্রিকায় প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি রিপোর্ট এবং *একাত্তরের অপ্রকাশিত দলিল* অবলম্বনে এ প্রতিবেদক তৈরি করেন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *যা ছিল অন্ধকারে*। *যা ছিল অন্ধকারে* পরে নাটকের পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

তদন্তকালে কমিশন ইস্টার্ন কমান্ডে নিয়োজিত পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য শোনে এবং প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে প্রাসঙ্গিক নানা ঘটনা ও বিষয়। এখানে কমিশনে বক্তব্য প্রদানকারী সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজনের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গণহত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত 'অপারেশন সার্চলাইট' এবং ডিসেম্বর মাসে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী কমিশনে বলে যে ২৫শে মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর পরিকল্পনা ছিল তার ও টিক্কা খানের। তার মতে সেই রাতের ধ্বংসযজ্ঞে যারা জীবন দিয়েছে তারা সবাই আওয়ামী লীগের সহিংস কর্মী ছিল। রাজারবাগ পুলিশ লাইনস এবং পিলখানার ঘুমন্ত পুলিশ ও ইপিআর সদস্যদের হত্যার কারণ সম্পর্কে রাও ফরমান আলী বলে, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি ছিল সহিংস, হঠকারী এবং পাকিস্তানবিরোধী। ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী হিসেবে পরিচিত রাও ফরমান আলী কমিশনে বলে যে এরকম কোনো পরিকল্পনা সে করেনি। তার মতে এরকম কিছু ঘটে থাকলে সেটা করা হয়েছে ঢাকার জিওসি মেজর জেনারেল জামশেদ-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কমিশনে বক্তব্য প্রদানকালে মেজর জেনারেল জামশেদ বলে যে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর।

লে. কর্নেল আজিজ আহাম্মেদ খান, প্রাক্তন কমান্ডিং অফিসার এইট বেলুচ রেজিমেন্ট এবং এইটটি সিক্স মুজাহেদিন ব্যাটালিয়ন। জয়দেবপুরে দায়িত্বে থাকাকালে তার নির্দেশে আশপাশের সকল বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। লুট করা হয় অস্থাবর সম্পদ। ধর্ষণ করা হয় অনেক বাঙালি মেয়েকে। বগুড়া ও ঠাকুরগাঁয়ে দায়িত্ব পালনকালে তার বাহিনী একইভাবে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। বিশেষ করে হিন্দু নিধন, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং হিন্দু রমণীদের ধর্ষণের ক্ষেত্রে লে. কর্নেল আজিজের বাহিনীর কুখ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। কমিশনে বক্তব্য রাখার সময় লে. কর্নেল আজিজ এসব ঘটনা স্বীকার করে এবং বলে যে ঊর্ধ্বতন কমান্ডের নির্দেশেই সে এসব করেছে। লে. কর্নেল আজিজ সুস্পষ্টভাবে কমিশনে বলে যে ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানবাজ আবরার সেখানকার সব বাড়ি ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে আরও জানায়, একইরকম নির্দেশ সে পেয়েছিল বগুড়া এবং ঠাকুরগাঁয়েও। লুট ও ধর্ষণ সম্পর্কে লে. কর্নেল আজিজ কমিশনে বলে, 'সৈন্যরা একবার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্বাদ পেলে তারা যা খুশি তাই করে বসে। এক্ষেত্রে আমার করার কিছুই ছিল না। আমি ২/১ বার সৈন্যদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে উল্টো প্রশ্ন করেছে, জেনারেল নিয়াজী নিজেই যখন ধর্ষণকারী তখন আমাদের থামতে বলেন কেন?'

কমিশনে লে. কর্নেল আজিজ আরও বলেছিল, 'বগুড়া ও ঠাকুরগাঁয়ে আমার ইউনিট পরিদর্শনে গিয়ে জেনারেল নিয়াজী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কত হিন্দু মেরেছ? টুয়েনটি থার্ড ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহ মালিক হিন্দুদের হত্যা করার লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে দায়িত্ব পালনকারী লে. কর্নেল মনসুর কমিশনে অকপটে স্বীকার করে যে এক রাতে সে ৫০০ বাঙালিকে হত্যা করেছে। অত্যন্ত গর্ব ভরে সে বলেছিল ওই ৫০০ লোককে হত্যা করতে তার এক রাউন্ড গুলিও খরচ হয়নি। সবাইকে জবাই করে হত্যা করার পর লাশগুলো শালদা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কমিশনে বক্তব্য প্রদানকালে ১৯ বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল নাঈম কমিশনের সামনে দ্বিধাহীনভাবে

নিরীহ মানুষকে হত্যার কথা স্বীকার করে এবং বলে যে মার্চের পর দুষ্কৃতকারীদের ধরার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে 'সুইপিং অপারেশন' নামে একটি অপারেশন চালানো হয়। কমিশনের এক প্রশ্নের জবাবে নাঈম জানায় যে তার ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। ফলে তাদের হাতে খুব বেশি মানুষ মারা যায়নি। তবে তার বাহিনী কত মানুষ মেরেছে তার আনুমানিক পরিসংখ্যানও দিতে পারেনি লে. কর্নেল নাঈম।

কত নির্মম ও নৃশংসভাবে বাঙালিদের হত্যা করা হয়েছে তা ধারণা করা যায় কমিশনে প্রদত্ত ব্রিগেডিয়ার তাসকিনের বক্তব্য থেকে। তার ভাষ্য অনুযায়ী 'দুষ্কৃতিকারী' বাঙালিদের হত্যার সময় আশপাশের গ্রামের জনগণ, এমনকি নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ফায়ারিং স্কোয়াডে বাধ্যতামূলকভাবে হাজির থাকতে হতো হত্যাযজ্ঞ দেখার জন্য। মা-বাবার সামনে ছেলের শরীরের, হাত-পায়ের চামড়া ছিলে ফেলা হয়েছে, স্বামীর সামনে তার স্ত্রীকে উলঙ্গ করে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তার যৌনাঙ্গ। এরকম নৃশংসতাকে যৌক্তিক প্রমাণের জন্য ব্রিগেডিয়ার তাসকিন কমিশনে বলেছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমাদের সোলজারদের নামানোর আগে প্রোপার ব্রিফিং দেওয়া হয়নি। বরং হাইয়েস্ট কমান্ড থেকে সৈন্যদের হত্যা, লুণ্ঠন ও চরম অত্যাচারের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছিল।'

হামুদুর রহমান কমিশনের অপ্রকাশিত রিপোর্টে কমিশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হামিদ খান ও মেজর জেনারেল খুদাদাদ খানের চরিত্রহীনতা, মাতলামি ও দুর্নীতির অভিযোগগুলোর যথার্থ তদন্তের জন্য পাকিস্তান সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পঁচন যে মাথায় শুরু হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত হিসেবে কমিশন তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্ত করেছিল।

পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার এবং সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল নিয়াজীর দুর্নীতি, লাম্পট্য ও চরিত্রহীনতার অনেক বিষয় কমিশনের পর্যালোচনায় উঠে আসে। এসব বিষয়ের মধ্যে ছিল: (১) নিয়াজীর বান্ধবী সাইদা বুখারি তার ছত্রছায়ায় লাহোরে 'সেনোরিটা হোম' নামে এক প্রতিষ্ঠানের আড়ালে গণিকালয় চালাতো; (২) মিসেস বুখারী নিয়াজীর পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে বিভিন্ন কাজের তদবির করিয়ে দিতো; (৩) শিয়ালকোটে শামিনি ফেরদৌস নামে আরেকজন বান্ধবী ছিল নিয়াজীর। সেও ঘুষ নিয়ে বিভিন্ন কাজের তদবির করিয়ে দিতো; (৪) ১৯৭১ সালে দায়িত্ব পালনের সময় ঢাকাতেও নিয়াজী অনেক সময় বান্ধবী পরিবেষ্টিত হয়ে সময় কাটাতো। ঢাকা শহরে নৈশবিহারের খ্যাতি ছিল তার। সেখানে অনেক সময় তার জুনিয়র অফিসাররা পর্যন্ত তার সঙ্গী হতো; (৫) যুদ্ধের সময়ও নিয়াজী বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পান ও অন্যান্য সামগ্রী চালান করত এবং এ কাজে সে সামরিক উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার এসব ব্যবহার করত। তার পণ্য পরিবহণে পিআইএ-কে অতিরিক্ত ওজন নিতে বাধ্য করত নিয়াজী।

সংখ্যলঘু হিন্দুদের হত্যার নির্দেশ দেওয়ার বিষয় কমিশনে অস্বীকার করে নিয়াজী। কমিশন সদস্যদের হতবাক করে দিয়ে নিয়াজী বলেছিল, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়নি।

বুদ্ধিজীবী নিধন– পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নৃশংসতম ঘটনার আর একটি উদাহরণ। বাঙালি জাতির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা, দার্শনিক ভাবনা এবং সৃজনশীলতাকে চিরদিনের জন্য দুর্বল করে দিতে, অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ভাবনা থেকে ঘটানো হয় এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র অনুযায়ী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে রাজাকার-আলবদর বাহিনীর সদস্যরা এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে।

কমিশনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় গণহত্যার জন্য নিয়াজী জেনারেল টিক্কা খানকে দায়ী করে। কমিশনকে সে জানায় যে টিক্কা খান গণহত্যা শুরু করে ২৫শে মার্চ। আর নিয়াজী ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্ব নেয় ১১ই এপ্রিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ও পরবর্তী কয়েকদিনের নির্বিচার গণহত্যার জন্য যে টিক্কা খানকে চেঙ্গিস খান, কসাই– এসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়, কিন্তু সেই জেনারেল টিক্কা খানকে বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনের সামনে হাজির করা হয়নি। কমিশনে হাজির থাকার জন্য টিক্কা খানকে কমিশন কোনো নোটিশও পাঠায়নি। এর কারণ, টিক্কা খানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর। সেজন্যই কমিশন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে অব্যাহতি দেয়। কমিশনের রিপোর্টের যে খণ্ডিত অংশ *ইন্ডিয়া টুডে* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে অনেক অনুল্লেখযোগ্য সামরিক কর্মকর্তার ছোটোখাটো ত্রুটি ও অপরাধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেও ২৫শে মার্চ হত্যাযজ্ঞের নায়ক টিক্কা খানের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি।

*ইন্ডিয়া টুডে*তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা বাংলাদেশে গণহত্যা, লুণ্ঠন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের জন্য একে অপরকে দোষারোপ করেছে। অধিকাংশ সামরিক কর্মকর্তা যাবতীয় ঘটনার জন্য ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ জেনারেল নিয়াজীকে এককভাবে দায়ী করে বক্তব্য দিয়েছে। কমিশনে অন্যান্য অভিযোগের পাশাপাশি রাও ফরমান আলীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের সুনির্দিষ্ট অভিযোগও উত্থাপিত হয়। অথচ ২৫শে মার্চের গণহত্যার পরিকল্পনাকারী, সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বিরুদ্ধে হামুদুর রহমান কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ না করে তাকে সকল ঘটনার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়। কারণ, সেও ঘনিষ্ঠ ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টোর।

কতটা বেপরোয়া এবং উদ্ধত ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নেওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা তার প্রমাণ পাওয়া যায় কমিশনে বক্তব্য রাখার সময় ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গি থেকে। তদন্ত কমিশনের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মানও প্রদর্শন করেনি অধিকাংশ মিলিটারি অফিসার। রাও ফরমান আলী, জাহানবাজ আবরারসহ বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসার নানা অজুহাতে কমিশনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ না করে চলে যায়। কমিশনও তাদের বক্তব্য সবটা শোনার জন্য তাদেরকে আর ডেকে পাঠায়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নিয়মমাফিক তাদের অনেককে চাকরিচ্যুত করেছিল। কিন্তু সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ধ্বংস, হত্যা, ধর্ষণ এবং লুটতরাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। বরং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পরাজিত এসব কর্মকর্তাদের প্রশ্রয় দিয়েছেন নানাভাবে।

হামুদুর রহমান কমিশন কোনো ট্রুথ কমিশন ছিল না। পাকিস্তানের মতো একনায়ক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কখনো স্বীকৃতি পায়নি। তাই এটা বলা ভুল হবে না যে হামুদুর রহমান কমিশন তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের উদ্দেশ্য সাধনেই নিয়োজিত ছিল। টার্মস অব রেফারেন্স (টি.ও.আর.) অনুযায়ী পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে সৈনিক থেকে দেশের সর্বোচ্চ সামরিক কর্মকর্তাদের অপকর্মের ছিটেফোঁটা যা *ইন্ডিয়া টুডে*তে প্রকাশিত কমিশনের খণ্ডিত রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে, খোদ পাকিস্তানের মানুষও এসব জেনে লজ্জায় অবনত হয়েছে। আর একটি আশ্চর্যজনক বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশের বিশিষ্ট বিচারপতিদের সামনে পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তারা অবলীলায় গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণের কথা স্বীকার করলেও পাকিস্তানের নড়বড়ে বিচার বিভাগের বিচারকরা এসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুপারিশ করেননি। অবশ্য পুরো রিপোর্টে তা করা হয়েছিল কি না তা জানা যায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে নির্বিচার হত্যা ও গণকবরের ফুটেজ অনেকেই দেখেছেন। অন্যান্য ছাত্রাবাসেও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তৎকালীন ইকবাল হল বর্তমানে শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে মর্টার আক্রমণের ফলে বহু ছাত্র নিহত হয়। মৃত ছাত্রদের লাশের সারি বিদেশি পত্রিকায় ছাপা হয়। বীভৎসতার করুণ ইতিহাস হয়ে আছে সেসব ছবি ও ঘটনা। অথচ কমিশনে বক্তব্য রাখার সময় দায়িত্ব পালনকারী সেনা কর্মকর্তরা সেসব ঘটনা পুরোপুরি অস্বীকার করে গেছে। কমিশনও সারা পৃথিবীর দেখা ঘটনা এবং প্রকাশিত সংবাদের ব্যাপারে তেমন জোরালো কোনো জিজ্ঞাসাবাদও করেনি।

অনেকের মনে এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অত্যাচার তাণ্ডব চালানোর সময় এখানে কি সিভিল প্রশাসনের অস্তিত্ব ছিল না? ছিল। প্রাদেশিক সরকারের চিফ সেক্রেটারি, সেক্রেটারি, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, মহকুমা প্রশাসক, থানায় সার্কেল অফিসার সব প্রতিষ্ঠানই ছিল। কিন্তু এগুলো ছিল অকার্যকর। পাকিস্তানের অসীম ক্ষমতাধর সিভিল সার্ভেন্টরা, যারা দীর্ঘ সময় পাকিস্তানে সামরিক শাসকদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করেছে, তারা ১৯৭১ সালে ছিল কলের পুতুল। আর্মির নির্দেশ প্রতিপালন ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভেন্টরাও সেনা সদস্যদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে। বিশেষ করে বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টরা, যারা সে সময়ে চাকরি করেছে, তাদেরকে চাকরি করতে হয়েছে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে। কমিশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজেদের দুরবস্থা এবং সামরিক বাহিনীর স্বেচ্ছাচারী আচরণ ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছিল ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) মোহাম্মদ আশরাফ ও বিভাগীয় কমিশনার সাঈদ আলমদার রাজা।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃজনের পর থেকেই দেশটি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক সরকার, বেসামরিক প্রশাসন আজও সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে গঠিত ও পরিচালিত হয়। পাকিস্তানের

সশস্ত্র বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা করে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সৈনিকেরা তাদের পেশা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজ ক্ষমতা ও পদবিকে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাশা ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে। সামরিক কর্মকর্তারা বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্ষমতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে পাকিস্তানের সকল স্তরের জনগণের ওপর। পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) এর মাত্রা ছিল ভয়াবহ। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও সামরিক স্বৈরশাসনের অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিল না।

পূর্ব রণাঙ্গনে অর্থাৎ বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবের স্বরূপ অন্বেষণ হামুদুর রহমান কমিশনের উদ্দেশ্য না হলেও বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তার জবানবন্দি এবং বক্তব্য থেকে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা বিশ্ব মানবতাকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাৎসী বাহিনীর নারকীয়তাকেও ম্লান করে দিয়েছিল।

পরাজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার নিজেদের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে। ঊর্ধ্বতন অফিসাররা সকল দোষ জুনিয়র অফিসারদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। জুনিয়র অফিসাররা বলেছে যে তারা যা করেছে সিনিয়রদের নির্দেশেই করেছে। সিনিয়র অফিসাররা তাদের হায়ার কমান্ডের নেতৃত্বের অসারতা, অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছে এবং সেনাবাহিনীর নিম্নস্তরের অফিসারদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের জন্য উচ্চতর কমান্ডকে দায়ী করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

একটি ফরমায়েশি কমিটি হওয়া সত্ত্বেও কমিশনে বক্তব্য প্রদানকারী সামরিক অফিসারদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য অনেক সময় কমিশনের সদস্যদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। কমিশন প্রথম দফায় ২১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে ও ১৯৭২ সালের ১২ই জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। ১৯৭৪ সালে ভারতে আটক যুদ্ধবন্দিরা পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করলে সরকারের নির্দেশে আরও ৭২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে কমিশন রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ করে।

*ইন্ডিয়া টুডে*তে প্রকাশিত খণ্ডিত রিপোর্টে সাক্ষীদের বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়নি। কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও অভিমত প্রদানকালে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু বক্তব্য সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা, বক্তব্য ও দায় বিশ্লেষণে কমিশনের পক্ষপাতমূলক মন্তব্য বার বার প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের পুরো ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে শুধু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্যই গঠন করেছিল এই বহুল আলোচিত তদন্ত কমিশন। এরকম একটি কমিশনও ফরমায়েশি তদন্ত সম্পাদন করতে গিয়ে জানতে পারে বাংলাদেশে গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের ভয়ানক সব তথ্যাবলি, যা পরোক্ষভাবে হলেও কমিশন রিপোর্টে স্থান পেয়েছে।

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, লুট, ধর্ষণ করে তার সাথে জড়িত ছিল সর্বোচ্চ পদের কর্মকর্তা থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সবাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বাপর ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ওই কমিশন জন্য গঠন করা হয়নি। কমিশনে বক্তব্য প্রদানকারী সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্যে কখনো কখনো রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু কমিশন তা এড়িয়ে গেছে। তবে কমিশন একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেনি বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও নিপীড়নকে। কমিশন সদস্যরা বিস্মিত হয়েছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড়ো বড়ো অফিসারদের ভীরুতা এবং কাপুরুষতা দেখে। অফিসারদের নৈতিক স্খলন এবং দুর্নীতিপরায়ণতার অবস্থা জেনে তারা স্তম্ভিত হয়েছেন। সত্য ও ন্যায়ের শপথ নেওয়া পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মিথ্যাচার শুনে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন।

হামুদুর রহমান কমিশনে বক্তব্য প্রদানকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা কেউই সব কথা বলেনি। কমিশনও শুনতে চায়নি সব কথা। কমিশন জানতে চায়নি কেন এবং কীভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে? পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে কত মানুষ হত্যা করেছে? কত নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করেছে? কত সম্পদ লুট করেছে এবং ধ্বংস করেছে কত ঘরবাড়ি ও স্থাপনা? এসব জানার জন্য তথ্যানুসন্ধানও করেনি হামুদুর রহমান কমিশন।

তারপরও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বক্তব্য গ্রহণকালে বর্বরতা, নৃশংসতা এবং অত্যাচারের যে সামান্য বিবরণ উঠে এসেছে, তাতেই কমিশন সদস্যগণ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এসব বর্বরতা আড়াল করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কমিশন রিপোর্টে তা একেবারে অনুল্লেখিত থাকেনি। অনেক কথা না বলে অনেক কিছু উল্লেখ না করে এবং ধ্বংস, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও বর্বরতার প্রকৃত চিত্র আড়াল করেও হামুদুর রহমান কমিশন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে কী মতামত প্রদান করেছিল? পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণসহ সেনা সদস্যদের লাম্পট্যপূর্ণ জীবন সম্পর্কেই বা কী অভিমত ব্যক্ত করেছিল?

কমিশনে প্রদত্ত বিভিন্নজনের বক্তব্য ও অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে বলা হয়, 'কমিশনের কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন পরিচালনায় তাদের জড়িত হবার সময় থেকে। এই প্রবণতা আবার দেখা দেয় ১৯৬৯ সালের মার্চে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারির সময় এবং এসব অভিযোগের বাস্তবিক সত্যতা রয়েছে যে বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা শুধু ব্যাপকভাবে জমিজমা, ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যই হাতাননি বরং অত্যন্ত অনৈতিক ও লাম্পট্যপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন। ... ১৯৭১ সালে ওই বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন, ব্যাপক দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কাপুরুষতা এবং ঊধ্বর্তন অফিসারদের চারিত্রিক স্খলন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের প্রধানতম কারণ। তথ্য প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় সকল পর্যায়ের সদস্য ১৯৭১ সালে নৈতিক অধঃপতনের জন্য সিদ্ধান্তহীনতা, কাপুরুষতা ও পেশাগত অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।'

বিচার বিশ্লেষণের পর কমিশন সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগে ছয় জন ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারকে কোর্ট মার্শালের বিচারের সুপারিশ করে। এই ৬ জন অফিসার হলো: (১) পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার এবং আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী, (২) ঢাকার ৩৬ ডিভিশনের জিওসি এবং উপ আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামসেদ, (৩) চাঁদপুরের ৩৯ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এম রহিম খান, (৪) ঢাকার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসি ব্রিগেডিয়ার জি.এম. বাকির সিদ্দিকী, (৫) নবম ডিভিশনের ১০৭ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত এবং (৬) ৩৯ ডিভিশনের ৫৩ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আসলাম নিয়াজী।

এই ছয়জন ছাড়াও কমিশন আরও কিছু উচ্চপদস্থ ও মধ্যম সোপানের অফিসারের বিভিন্ন অপরাধের তদন্ত ও বিচারের সুপারিশ করে। কমিশন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৭টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উল্লেখ করেছে যা তাদের পরাজয়ের পথ তৈরি করেছে। এগুলো হলো: (১) ঢাকায় ১৯৭১-এর ২৫ ও ২৬শে মার্চ সামরিক অভিযান শুরুর সময় অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ ও গোলাগুলি চালানো; (২) সামরিক পদক্ষেপ শুরুর পর গ্রামাঞ্চলে দুষ্কৃতকারীমুক্ত করার অভিযানে নির্বিচার হত্যা ও অগ্নিসংযোগ; (৩) শুধু সামরিক অভিযানের প্রথম দিকেই নয়, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী প্রভৃতি পেশাজীবীদের হত্যা ও গণকবরে পুঁতে রাখা; (৪) ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যদের, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করার সময় এবং তাদের বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে হত্যা করা: (৫) সামরিক শাসন চালানোর সময় পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হত্যা এবং তাদের বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া; (৬) পাকিস্তান আর্মির অফিসার ও সৈন্যদের দ্বারা প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ও অত্যাচারের জন্য বহুসংখ্যক পূর্ব পকিস্তানি নারী ধর্ষণ; (৭) সংখ্যালঘু হিন্দুদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা।

কমিশন যে কতটা রেখেঢেকে রিপোর্ট দাখিল করেছে তার অন্যতম প্রমাণ হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার কসাই হিসেবে পরিচিত টিক্কা খান সম্পর্কে রিপোর্টে কোনো সুপারিশ করা হয়নি। টিক্কা খানকে কমিশনে ডাকাও হয়নি। সাধারণ অভিযোগ বর্ণনার সময় বুদ্ধিজীবী হত্যার উল্লেখ করলেও বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাকারী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ব্যাপারেও কমিশন কোনো সুপারিশ করেনি।

বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরাজয় বরণকারী পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কোনো সদস্যের শৃঙ্খলাভঙ্গ, ভীরুতা এবং কাপুরুষতার বিচার হয়নি। তাদের কৃত হত্যা, ধ্বংস, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং বিভীষিকার বিচার তো দূরের কথা। আজ পর্যন্ত প্রকাশও হয়নি এ রিপোর্ট। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্দেশে গঠিত হয় কমিশন। পাকিস্তানের *দ্য ডন* পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, কমিশনের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর ভুট্টো রিপোর্টের প্রতিটি পাতা পুড়িয়ে ছাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৯৮ সালে *ইন্ডিয়া টুডে* পত্রিকায় হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের সম্পূরক অংশ প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় রিপোর্টটির সত্যতা মেলে প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়ায়। তারা খতিয়ে দেখতে শুরু করে এ রিপোর্ট বাইরে গেল কীভাবে? ১৪ই আগস্ট ২০০০ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী জাভেদ জব্বার *দ্য ডন* পত্রিকাকে বলেন, পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দেবে।

সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না। অসত্য ও অন্ধকারের ঘেরাটোপ ভেদ করে সত্য এক সময় প্রকাশিত হয়ই। আর সেকারণেই খুব সীমিত টার্মস অব রেফারেন্স নিয়ে গঠিত হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টকেও লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী হত্যার বিচার হচ্ছে। ভীষণ পরাক্রমশালী, ক্ষমতাধর অপরাধীদের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পথে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তি ঘটছে। কোটি কণ্ঠে বাজছে বিজয়ের জয়গাথা, জীবনের জয়গান।

হারুন রশীদ: লেখক, নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটিই আমরা জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, একটি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মহান নেতা– এ কথা যেমন আমরা জানি, তেমনি জানি তিনি ছিলেন শিশুদের পরম বন্ধু। শিশুপুত্র রাসেলই যেন অস্তিত্ববান হয়ে উঠত পৃথিবীর সকল শিশুর মাঝে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি সব শিশুই যেন হয়ে উঠত তাঁর চোখে এক একজন রাসেল। সে সূত্রে তাঁর জন্মদিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করা ছিল বাংলাদেশ সরকারের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার পৃথিবীজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশেও পালিত হয়। পক্ষান্তরে ১৭ই মার্চ বাংলাদেশে পালিত হয় জাতীয় শিশু দিবস। বিশ্ব শিশু দিবসের আয়োজক সংস্থা ইউনিসেফ এবং আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন। জাতীয় শিশু দিবসের আয়োজক সংস্থা বাংলাদেশ সরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর দেশে দেশে বহু মানুষ নিহত হয়, নিহত ও আহত হয় অসংখ্য শিশু, অনেক শিশু হয়ে পড়ে এতিম। ১৯২৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত লিগ অব নেশনসের কনভেশনে ঘোষণা করা হয়– মানব জাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেবার আছে, শিশুরাই তা পাবার যোগ্য। শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের প্রতি কনভেশন থেকে আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুনরায় লক্ষ লক্ষ শিশু নিহত কিংবা আহত হয়। অসংখ্য শিশু হয়ে পড়ে এতিম কিংবা অসহায়। ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তায় অসংখ্য শিশু হয়ে পড়ে বিকলাঙ্গ। এসবের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শেষে ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত হয় শিশু অধিকার সনদ।

বিশ্ব শিশু দিবস শিশুদের প্রতি মানবিক আচরণের আহ্বান জানায়, শিশুদের চেতনায় আন্তর্জাতিক ভাবনা বিকাশের আহ্বান জানায়। বিশ্ব মানবতাবাদ বিকাশে এই দিবসের তাৎপর্য তাই অপরিসীম। পক্ষান্তরে জাতীয় শিশু দিবস শিশুদের চেতনায় নিজ জাতিসত্তা উপলব্ধির আহ্বান জানায়। জাতীয় শিশু দিবস শিশুদের অন্তরে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উপলব্ধির অবারিত এক সুযোগ এনে দেয়। এ কথা সত্য যে, জাতীয় চেতনায় বিকশিত হয়েই উত্তীর্ণ হতে হয় বিশ্ব চেতনায়। তাই বিশ্ব শিশু দিবসের মতোই জাতীয় শিশু দিবসের তাৎপর্যও অপরিসীম। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের শিশুই প্রথমে জাতীয় সত্তায় বিকশিত হবে, তারপর নিরন্তর সাধনায় ক্রমে পৌঁছে যাবে বিশ্ব মানবিক সত্তায়। এই বিশ্বাত্মচেতনার কথা বিবেচনা করলে বিশ্ব শিশু দিবসের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষঙ্গ।

২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব থেকেই ছিলেন শিশু তথা মানবদরদি। বর্ষায় ছাতা না থাকার ফলে শিশু-শিক্ষার্থী ভিজে গেছে দেখে নিজের ছাতাটি তাকে দিয়ে দেওয়া, কিংবা শীতে কাঁপতে থাকা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিজের গায়ের চাদর দেওয়া– এসব কথা তো বঙ্গবন্ধুর জীবনে কিংবদন্তি হয়ে গেছে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থী থাকার সময় সহপাঠীদের সহায়তায় গ্রামে পাঠশালা তৈরি করেছিলেন দরিদ্র শিশুদের জন্য। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় শিক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা ভেবে শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে ছাত্রাবাস মেরামতের অর্থ আদায় করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান– এ কথাও আজ যেন কিংবদন্তি। বঙ্গবন্ধুর শৈশবকালীন এসব ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিশু-কিশোর তথা মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা ছিল কত গভীর।

উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি– শিশুদের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ও সহানুভূতি আরও প্রবল হয়েছে। জটিল সংকটময় রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির মাঝেও যখনি তিনি শিশুদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেতেন, তখন সব কিছু বিস্মৃত হয়ে তিনি নিজেই যেন সরল এক শিশু হয়ে যেতেন, শিশুসত্তায় তিনি মিশে যেতেন অন্য শিশুদের সাথে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ইতিহাস থেকে

এমন দু'একটা অনুষঙ্গ বিবৃত করলেই অনুধাবন করা যাবে শিশুদের প্রতি তাঁর মায়া আর ভালোবাসার মাত্রা।

১৯৭২ সালের মার্চ মাস। বঙ্গবন্ধু যাবেন সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরে। তিনি সেখানে কিছু উপহার নিয়ে যেতে চাইলেন। শিল্পাচার্য পরামর্শ দিলেন একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিশুদের আঁকা ছবির অ্যালবাম নেওয়ার কথা। বঙ্গবন্ধু মহাখুশি। তাঁর দেশের মুক্তিযুদ্ধের ছবি শিশুরা আঁকবে, আর তা দেওয়া হবে মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকারী অন্যতম শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের হাতে। শিল্পাচার্যের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৫ জন শিশু মোট ৩০টি ছবি আঁকলো। সুন্দর একটা অ্যালবামে ছবিগুলো বঙ্গবন্ধুর হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। সিদ্ধান্ত হলো শিশু-চিত্রশিল্পীদেরও নিয়ে যাওয়া হবে বঙ্গবন্ধুর কাছে। কিন্তু বাধ সাধলো গণভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সারাদিন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত থাকেন– এতগুলো 'বাচ্চা-কাচ্চা' নিয়ে গেলে তাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটবে, তাই ওদের নেওয়া যাবে না, এ কথা জানিয়ে দিলেন নিরাপত্তা কর্মকর্তা। কীভাবে যেন কথাটা পৌঁছলো বঙ্গবন্ধুর কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে শিশু-শিল্পীদের নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। শিশুরা ভেতরে ঢুকতেই বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে উঠলেন, ওদের অভ্যর্থনা জানালেন। শিশুদের ছবি দেখে বঙ্গবন্ধু মুগ্ধ হলেন, হলেন অভিভূত– একইসঙ্গে বেদনাবিহ্বল। শিশুদের ছবিতে ফুটে উঠেছে গণহত্যার ভয়াবহতা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতা, একইসঙ্গে বাঙালির প্রতিরোধের কথা। ছবিগুলো দেখে বঙ্গবন্ধুর চোখ অশ্রুসজল হলো। তিনি ক্ষুদে-শিল্পীদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন আর বললেন, 'আজকের কর্মব্যস্ত দিনের মধ্যে এই একটুখানি সময়ের জন্য আমি শান্তি পেলাম। শিশুদের সান্নিধ্য আমাকে সব অবসাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে।'

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। গুলিস্তানের শহিদ মতিউর শিশুপার্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কচিকাঁচার মেলায় জাতীয় শিক্ষা শিবির। তৎকালীল ১৭টি জেলা থেকে শিশুরা এসেছে শিবিরে প্রশিক্ষণ নিতে। শিবির পরিদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু শিবিরের সমাপ্তি দিনের সকালে তিনি খবর পাঠালেন ব্যস্ততার জন্য তিনি যেতে পারবেন না, তবে তিনি শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে চান। সব শিশু যেন গণভবনে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। তিনি শিশুদের আনার জন্য অনেক বাস পাঠালেন। ১৭টি জেলার শত শত শিশু গণভবনে গেল– গণভবনের সবুজ আঙ্গিনায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। কচিকাঁচার মেলার টুপি পরিধান করে বঙ্গবন্ধু শিশুদের গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলেন, মার্চ পাস্টের সালাম গ্রহণ করলেন। শিশুদের লাঠি খেলা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন, সবার হাতে তুলে দিলেন মিষ্টির প্যাকেট। চঞ্চল এক শিশুকে ডেকে নাম জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু। ঘটনাচক্রে ওই শিশুর নাম ছিল মুজিবুর রহমান। শিশুর নাম শুনে উচ্ছ্বসিত বঙ্গবন্ধু ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে জোরে বলে উঠলেন– 'পেয়েছি আমার মিতাকে পেয়েছি।'

১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস। বঙ্গবন্ধুর শুভেচ্ছা জানানোর জন্য চারটি শিশু সংগঠনের আটশো শিশু সমবেত হলো নতুন গণভবন প্রাঙ্গণে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান কচিকাঁচার মেলা ও খেলাঘর আসর এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্কাউটস ও গার্ল গাইডস-এর ছেলেমেয়েরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর আগমনের প্রতীক্ষায়। বঙ্গবন্ধু এলেন, শিশুদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তিনি নিজেও হয়ে উঠলেন এক চঞ্চল শিশু। রাষ্ট্রীয় কোনো প্রটোকলের বালাই নেই, নেই নিরাপত্তার তোড়জোড়। শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা আর দুষ্টুমিতে বঙ্গবন্ধু সময় কাটাচ্ছেন মহাআনন্দে। শিশুদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি গাইছেন– 'আমরা রক্ত দিয়ে দেশ এনেছি, দেশ আমাদের প্রাণ।' চাওয়া মাত্র শিশুদের তিনি অটোগ্রাফ দিচ্ছেন, নিরাশ করছেন না কাউকে, বলছেন না ব্যস্ততার কথা। বয়স্করা শিশুদের শৃঙ্খলা রক্ষার কথা বললে, বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন– 'ওরা শিশু, ওদের এত শৃঙ্খলা কীসের? এখন খেলার বয়স, চঞ্চলতার বয়স।' হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এই গণভবন তোদের। ইচ্ছামতো খেলা কর। তবে দেখিস আমার চারাগুলো যেন নষ্ট না হয়।' বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা সারি ভেঙে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করল। বঙ্গবন্ধু মহাখুশি। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, 'চল, তোদের মাছ দেখাই।' এই বলেই তিনি শিশুদের নিয়ে গেলেন গণভবনের পূর্ব পাশে পাড় বাঁধানো পুকুরের কাছে। বঙ্গবন্ধু সজোরে তিনবার হাততালি দিলেন– মাছেরা এসে হাজির। শিশুদের বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দেখ মাছেরা কথা শোনে, কিন্তু মানুষকে সহজে কিছু শোনানো যায় না।' মাছের খেলা দেখার জন্য শিশুরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। বঙ্গবন্ধু তাঁকে ঘিরে রাখা দেহরক্ষীদের সতর্ক করে বললেন, 'তোরা এখানে আমাকে কেন পাহারা দিচ্ছিস? দেখছিস না, শিশুরা ছুটাছুটি করছে। শিশুদের পাহারা দে, যাতে একটি শিশুও পুকুরে পড়ে না যায়।'

মাছের খেলা দেখে শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন গণভবনের সবুজ লনে। শিশুদের সঙ্গে খেলায় পুনরায় মেতে উঠলেন বঙ্গবন্ধু। ক্রমে বিদায় নেওয়ার সময় এলো। শিশুরা সারিবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সাথে বেরিয়ে আসছিল গণভবন থেকে। বঙ্গবন্ধু শিশুদের সাথে গণভবনের প্রধান ফটক পর্যন্ত এলেন, সবাইকে বিদায় দিলেন। গণভবনের সামনের রাস্তায় তখন কয়েকটা গাড়ি চলছিল। গার্ডকে ডেকে বললেন, 'শিশুরা না যাওয়া পর্যন্ত কোনো গাড়ির চাকা ঘুরবে না। বলে দিস, এটা প্রেসিডেন্টের অর্ডার।' শিশুরা যাতে দুর্ঘটনায় না পড়ে সেজন্য বঙ্গবন্ধু সেদিন দিয়েছিলেন এই নির্দেশ। এখানে একটা কথা বলা খুব জরুরি। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য গণভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন বিদেশি বহু কূটনীতিক, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাদের সাথে কথা বলার সময়েই যখন শিশুরা গণভবনে এলো, তিনি কোনো কথা না বলে মুহূর্তেই চলে এসেছিলেন শিশুদের কাছে। সেদিন তিনি কোনো প্রটোকল মানেননি। এমনকি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে শিশুদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেখানে মাত্র পনেরো মিনিট বরাদ্দ ছিল, মন্ত্রীদের পীড়াপীড়িতে বঙ্গবন্ধু যখন পুনরায় কূটনীতিকদের কাছে গেলেন ততসময়ে পেরিয়ে গেছে পুরো দেড় ঘণ্টা।

বঙ্গবন্ধু যেমন ছিলেন কঠোর, কঠিন– তেমনি ছিলেন সরল এক শিশু। শিশুর সারল্য তাঁকে মুগ্ধ করত, তাঁর ভালো লাগত শিশুর চাঞ্চল্য। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর মায়া আর ভালোবাসা অভিন্ন সত্তায় ছড়িয়ে পড়ুক বাংলাদেশের সব শিশুর অন্তরে, বিশ্বের সব শিশুর চিত্তলোকে এবং এভাবেই তারা হয়ে উঠুক বিশ্ব নাগরিক।

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ: লেখক, গবেষক ও অধ্যাপক, সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ৮ই মার্চ ২০২৪ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'সেরা জয়িতা পুরস্কার ২০২৩' প্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন- পিআইডি

দেশের অগ্রযাত্রায় নারীর ভূমিকা

ফারহানা রহমান

নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নের পথে সমান তালে, সমান গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ। দেশের তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ, বাস্তবায়নের কাজ চলছে। নারী তার মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সব অগ্রগতি এবং উন্নয়নে করেছে সমঅংশীদারিত্ব। আর তাই বদলে গেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বীকৃতি। তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে জনপ্রতিনিধিসহ প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, সামরিক, বেসামরিক প্রশাসনের সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে যুক্ত আছে দেশের প্রবৃদ্ধির হার কী হবে, সর্বজনীন মানবাধিকার কতটা গভীরতা পেল এবং পরিশীলিত মুক্তমনা প্রজন্ম তৈরিতে আমরা কতটা সফল হচ্ছি– লন্ডনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) প্রতিবছর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি নিয়ে প্রক্ষেপণ করে, যা 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল' নামে পরিচিত। ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চলতি মূল্যে ২০৩৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপির আকার হবে এক হাজার ৬২৮ বিলিয়ন ডলার (দেড় ট্রিলিয়নের বেশি), অর্থাৎ বাংলাদেশ ২০২২ সালের ৩৪তম অবস্থান থেকে ১৪ ধাপ এগিয়ে ২০৩৭ সালে ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। এই সিইবিআরের মতে, বাংলাদেশে ২০৩২ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের (এক হাজার ৮১ বিলিয়ন ডলার) অর্থনীতি হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত ব্লুমবার্গ সংবাদ সংস্থা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় তাঁর সময়োচিত সংস্কার পদক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য।

গত দশকে কোভিড-১৯-এর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্য অন্যতম ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন সূচক যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুতে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সফলতা দেখিয়েছে তা বিশ্বের খুব কম দেশের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জ, শিক্ষায় লিঙ্গসমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কোর 'শান্তি বৃক্ষ' এবং গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম। বিগত দশকে বাংলাদেশ নারীর জীবনমান উন্নয়নে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে।

নারীর তথা দেশের অগ্রযাত্রায় সরকার নিয়েছে নানামুখী কর্মসূচি। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর

সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সূচকের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষত পরিবারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রেখেছে। তাছাড়া নব্বইয়ের দশকে ব্যাপক হারে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ভর্তির হার এখন ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যে সামাজিক পুঁজির উদ্ভব ঘটে তার মূল কারণ সরকারের দূরদর্শী নীতির ফলে দলভিত্তিক ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ২০০৬ সালের ২৯ শতাংশ এবং ২০১৭ সালের জরিপের ৩৬.৩ শতাংশ থেকে এখন ৪৩ শতাংশের কাছাকাছি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎস তৈরি পোশাক খাতের যে ৪০ লাখের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে তার ৮০ শতাংশের বেশি হলো নারী। বাংলাদেশ সরকার উচ্চশিক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-৩১ অবলম্বন করেছে। ২০২২ সালে উচ্চশিক্ষায় (টারশিয়ারি) নারীদের ভর্তির হার ১৭.১৯ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার (ডিগ্রি/মাস্টার্স/পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট/অন্যান্য) ক্ষেত্রে ছাত্রীদের ভাগ ৪৫.০৩ (২০২২) শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা খাতে অভূতপূর্ব পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিকে ছাত্রী সংখ্যা ১০৪-এর বিপরীতে ছাত্র সংখ্যা ১০০ এবং মাধ্যমিকে ১১৪ ছাত্রী সংখ্যার বিপরীতে ছাত্র ১০০। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের অনুপাত সরকারি ক্ষেত্রে ৬৪.৪১ শতাংশ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ৬৬.০৩ শতাংশ। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে নারী শিক্ষার প্রসার বড়ো ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা, শিশু ও পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশুদের মৃত্যুহার কমানো, মাতৃমৃত্যু হার কমানো, টিকার পরিধি বাড়ানো ও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। ২০১০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক এমডিজি-৪ এর অভীষ্ট শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ করেন। আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন কর্তৃক ২০১১ সালে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এমডিজি-৪ ও এমডিজি-৫, শিশুমৃত্যু হার ও মাতৃমৃত্যু হার কমানোর জন্য তিনি সাউথ-সাউথ গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেন পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উইমেন ইন পার্লামেন্ট ও ইউনেস্কো কর্তৃক দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা কমানোয় নেতৃত্বের জন্য উইমেন ইন পার্লামেন্ট ফোরাম পুরস্কার আর ইউএন উইমেন কর্তৃক শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতির অসামান্য অর্জনের জন্য 'ট্রি অব পিস' অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৬ সালে তিনি নারী ক্ষমতায়নের জন্য আরও দুটি স্বীকৃতি লাভ করেন। একটি হলো ইউএন উইমেন কর্তৃক প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার আর অন্যটি হলো গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম কর্তৃক এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড। ২০১৮ সালে তিনি বাংলাদেশ এশিয়া ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী শিক্ষা ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে নেতৃত্বদানের জন্য গার্লস উইমেন সামিট কর্তৃক গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রণীত বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। জেন্ডার সমতায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে নবম।

নারীরা দেশের অগ্রগতিতে অগ্রসর হলেও নারীর সার্বিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে আমাদের আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধসহ (৫৪ শতাংশ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতারোধ ও সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন একটা অপরিহার্য অংশ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাহীন, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদমুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মজীবী নারী ও নারী উদ্যোক্তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভাগীয় শহরগুলোতে মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দূরদর্শী উন্নয়ন ভাবনারই প্রতিফলন। 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১৫' প্রণয়ন, পাসপোর্টে মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে দিয়েও সমাজে নারীর অবস্থান সুসংহত হয়েছে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। যখন আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজে নারীর আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তাই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ কার্যক্রমে সরাসরি নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র দৃষ্টিগোচর না হলেও পরোক্ষভাবে এই উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সারা দেশে প্রায় শতভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা থাকায় নারীর নিরাপত্তা বেড়েছে। বিদ্যুতায়িত ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র প্রশিক্ষিত নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। যেসব নারী ঘরের বাইরে যেতে পারেন না, তারাও পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকায় ঘরে বসে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সাথে যুক্ত হতে পারছেন। তারা অনলাইন ব্যাবসাসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজেও যুক্ত হচ্ছেন।

সর্বোপরি দেশের অগ্রযাত্রায় নারী পুরুষ সকলে মিলে একসাথে কাজ করতে হবে। তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ফারহানা রহমান : পরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

এন্থনী ম্যাসকারণহাসের প্রথম রিপোর্ট

'পাকিস্তান সেনাবাহিনী মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে হাজার হাজার পূর্ব পাকিস্তানী নাগরিককে সুপরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করেছে। এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সেই সময় থেকে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে ঘটনার বাস্তবতাকে পরোক্ষভাবে উন্মোচিত করেছেন। তাছাড়া কলেরা ও দুর্ভিক্ষকে সামনে রেখে ৫০ লাখ মানুষ বাস্তুত্যাগী হল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ যে তার কারণ সে কথা না বুঝার অবকাশ নেই আপাতত।'

সানডে টাইমস-এর পাকিস্তানস্থ সংবাদদাতা এন্থনী ম্যাসকারণহাস পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটছে সে কথা প্রথমবারের মত বিশ্ববাসীকে জানালেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখানে কি করছে তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন এবং সে কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি পাকিস্তান ছেড়ে এসেছেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী শুধুমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থকদের হত্যা করে ক্ষান্ত হচ্ছে না, তারা এক নাগাড়ে হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে হত্যা করে চলেছে। হিন্দুদের গুলী করে এবং পিটিয়ে মারা হচ্ছে। তাদের অপরাধ যেহেতু তারা হিন্দু। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বাস্তুত্যাগী, মিশনারী এবং কূটনীতিবিদদের কাছ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতার খণ্ড খণ্ড চিত্র ও অসমর্থিত খবর বহির্বিশ্বের লোকেরা জানলেও এন্থনী ম্যাসকারণহাস-এর স্বচক্ষে দেখা সে বর্বরতার খবর বিশ্ববাসীকে জানতে দিল যে, কেন লাখ লাখ লোক সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

মার্চ মাসের শেষ দিকে বাঙ্গালী বিদ্রোহীদের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য দুই ডিভিশন পাকিস্তানী সৈন্য বিমান পথে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়। এর প্রায় দুই সপ্তাহ পরে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলা দেখার জন্য ৮ জন পাকিস্তানী সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানান। এই সাংবাদিকদের পূর্ব বাংলা সফর করার আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে এটাই কারণ ছিল যে, 'স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এসেছে' তার চিত্র যাতে করে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের কাছে পরিবেশন করেন। ৭ জন সাংবাদিক পাকিস্তান সরকারের সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র সাংবাদিক *করাচী মর্নিং নিউজের* সহকারী সম্পাদক এবং পাকিস্তানস্থ *সানডে টাইমস*-এর সংবাদদাতা এন্থনী ম্যাসকারণহাসই ছিলেন ব্যতিক্রম।

১৯৭১ সালের ১৮ই মে মঙ্গলবার এন্থনী *সানডে টাইমস*-এর লন্ডনস্থ কার্যালয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হন। তিনি জানান যে, পূর্ব বাংলায় কি হচ্ছে এবং ৫০ লাখ লোক কেন বাস্তুত্যাগী হল তার সঠিক চিত্র তিনি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে চান। তবে তিনি একথাও জানালেন যে, এখনই যদি তা তিনি প্রকাশ করেন, তাহলে তার পক্ষে করাচী ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কেননা পাকিস্তান ছেড়ে আসার ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। সুতরাং সেখানে তার সবকিছু গোছগাছ করে পাকিস্তানে তার সম্মানিত সাংবাদিকতার চাকরীটি ত্যাগ করে আসতে হবে এবং *সানডে টাইমস* কর্তৃপক্ষকে কথা দিতে হবে যে, তার পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন এবং সেখান থেকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিরাপদে লন্ডন না আসা পর্যন্ত একথা যেন প্রকাশ না করা হয়। *সানডে টাইমস* পত্রিকা এন্থনীকে সে প্রতিশ্রুতি পালনের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

এন্থনী ম্যাসকারণহাস অতঃপর করাচী ফিরে যান এবং ১০ দিন পর *সানডে টাইমস*-এর জনৈক কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ঠিকানায় 'সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, সোমবার যাত্রা শুরু হবে' এই মর্মে একটি তার বার্তা পাঠান এবং তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের পাকিস্তান ত্যাগের অনুমতি দিলেও এন্থনীকে দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবুও শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচিয়ে তিনি লন্ডন এসে পৌঁছান।

এন্থনী হিন্দু অথবা মুসলমান কোনটাই নন, তিনি একজন গোয়ানিজ খৃষ্টান। ১৯৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানে বাস করছিলেন। এন্থনী বলেন, তাদেরকে যখন পূর্ব বাংলা সফরে পাঠানো হয়, তখন তথ্য দফতর থেকে তাদেরকে বলা হয় যে, সেনাবাহিনী দেশপ্রেমের মহান কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ব বাংলায় যা করছে, সাংবাদিকরা যেন তাদের সেই মহৎ কর্মের দিকটি তুলে ধরেন।

এন্থনী ম্যাসকারণহাস লিখছেন যে, 'আমি পূর্ব বাংলার কি দেখেছি তা প্রথম দিকটায় চেপে যাই এবং ২রা মের *সানডে টাইমস*-এ যে রিপোর্ট লিখি তাতে ২৫ ও ২৬শে মার্চে বাঙ্গালী বাহিনী কর্তৃক অবাঙ্গালী হত্যার কিছু কথা লিখেছিলাম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন একথা লিখলেও পাকিস্তানী সেন্সর কর্তারা সেটুকু বাদ দিয়ে দেন, তার কয়েকদিন পর ঠিক করলাম সেখানে যা দেখেছি হয় তার পূর্ণ বিবরণ লিখব, নয়ত বা একেবারেই কিছুই লিখব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি লন্ডন আসব।'

আবদুল বারী ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেল

এন্থনী ম্যাসকারণহাস লিখছেন, পূর্ব বাংলার হাজার হাজার মানুষের মত আবদুল বারী টহলদানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের দেখে দৌড় মেরেছিল এবং দৌড়ে সে ভুল করেছিল। ২৪ বছর বয়স্ক এই যুবকটি পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় শুধু কাঁপছিল। কেননা সে জানত যমদূত তার সামনে হাজির হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে কুমিল্লা থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে মুজাফফরগঞ্জে। ৯ম ডিভিশনের মেজর রেথর আমাকে জানান, 'যেহেতু সে দৌড় দিয়েছিল, সেজন্য তাকে আমরা হত্যা করতাম, কিন্তু আপনার জন্য তাকে হত্যা না করে তল্লাশী চালালাম তার শরীরে, এজন্যে যে, আপনি নবাগত।' এন্থনী জিজ্ঞেস করলেন মেজরকে, তাকে কেন মারা হত? মেজর উত্তর করল, – যেহেতু সে একজন হিন্দু, অথবা একজন বিদ্রোহী, কিংবা সম্ভবতঃ সে একজন ছাত্র অথবা একজন বাঙ্গালী। এন্থনীর আরেক প্রশ্নের জবাবে মেজর বলল, হিন্দুরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টায় আছে। এখন এই যুদ্ধের মধ্যে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অপূর্ব সুযোগ তাদের হাতে এসেছে।

এন্থনী ম্যাসকারণহাস তার রিপোর্টে বলেন, মার্চের শেষ দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সংঘর্ষ চলাকালে যে সব অবাঙ্গালী গোলযোগের মধ্যে প্রাণ হারায়, পাকিস্তান সরকার শুধু তাদেরটাই সমগ্র বিশ্বে প্রচারের ব্যবস্থা করে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে

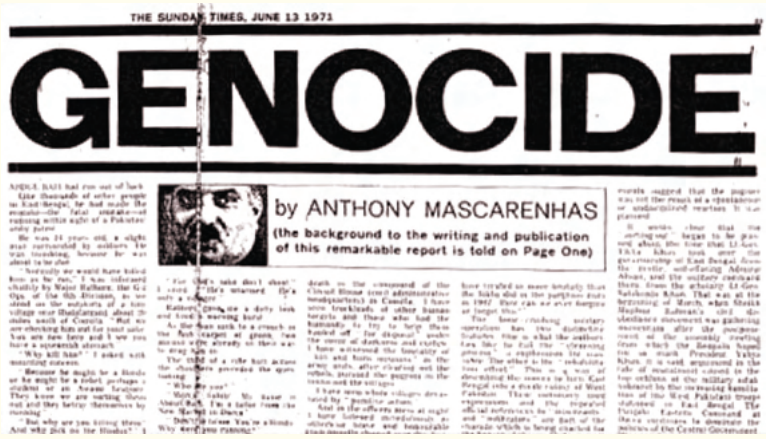

THE SUNDAY TIMES, JUNE 13 1971

GENOCIDE

by ANTHONY MASCARENHAS

(the background to the writing and publication of this remarkable report is told on Page One)

বাংলাদেশের বুকে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে সে কথা তারা বেমালুম চেপে যায়।

যাই হোক আবদুল বারীর ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। আমরা চাঁদপুর সফর থেকে যখন মুজাফফরগঞ্জে ফিরে এলাম (সন্ধ্যার আগেই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা রাতের বেলায় বাইরে বেরুত না) এবং আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। এটা ঠিক সূর্যাস্তের সময়ের ঘটনা। সামনে অপেক্ষমান একটি টয়োটা ল্যাণ্ড ক্রুজারের পেছন থেকে হঠাৎ একজন জোয়ান হেকে উঠল, স্যার একটা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। সাথে সাথেই মেজর পজিশন নিল তার চীনে তৈরী হালকা মেশিনগান নিয়ে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, দোহাই আপনার ওকে মারবেন না। নিরস্ত্র এ লোকটি একজন গ্রামবাসী ছাড়া আর কেউ না। মেজর আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সতর্কসূচক ফাঁকা আওয়াজ করল, ততক্ষণে দুইজন জোয়ান ধান ক্ষেতের মধ্য থেকে লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার কাঁধে আঘাত করে জিজ্ঞাসা করা হল তার পরিচয়। লোকটি ভয়ে কাঁপছিল, করজোরে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন আমি ঢাকা নিউমার্কেটের একজন দর্জি। ধমক দিয়ে মেজর তাকে বলল, 'আমার সাথে মিথ্যে কথা বল না, তুমি একজন হিন্দু।' লোকটি প্রত্যুত্তর করল, 'কার্ফুর সময় হয়ে গেছে তাই আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলাম।'

এই সময় একজন জোয়ান তার লুঙ্গি খুলে ফেলল এবং দেখতে চেষ্টা করল সে হিন্দু না মুসলমান। শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত সে মুসলমান। এন্থনী লিখছেন যে, এগুলো তার উপস্থিতিতেই করা হল। কিন্তু তবু তাকে ছেড়ে দেওয়া হল না। তাকে আবার প্রশ্ন করা হল কেন সে দৌড়াচ্ছিল। বারী কিন্তু এবার কোন উত্তর করতে পারল না শুধু দুই চক্ষু মুদে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল।

একজন জোয়ান বলে উঠল, তাকে মুক্তিফৌজের মত মনে হচ্ছে। মেজর বলল, 'হতে পারে'। আবদুল বারীকে মুক্তি দেয়া হল না। তাকে দেয়ালের দিকে নিয়ে যেয়ে ক্রমাগত রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হতে লাগল। বারী এই সময় বাংলাতে কি যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল। মাথাটা তার এলিয়ে পড়েছে। তারপর পার্শ্ববর্তী একটা কুঁড়ে ঘর থেকে এক বৃদ্ধকে টেনে এনে বারীকে সনাক্ত করতে বলা হলে বুড়ো তাকে ঢাকা নিউমার্কেটের দর্জি বারী বলেই চিহ্নিত করলে মেজর আশ্বস্ত হল, কিন্তু জোয়ানগুলো তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি। যাই হোক বারী বেঁচে গেল এবং ধরতে গেলে অলৌকিকভাবেই।

এন্থনী মাসকারণহাস লিখছেন, কুমিল্লাস্থ ৯ম ডিভিশনের অফিসারদের সাথে তিনি ৬ দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সময় তিনি দেখেছেন সামরিক বাহিনীর লোকদের হিন্দুদের সন্ধানে গ্রামের পর গ্রাম খুঁজে ফিরতে, লুঙ্গি খুলে সৈন্যরা দেখেছে তাদের খৎনা দেয়া আছে কিনা এবং খৎনা না দেয়া হলে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে তিনি শুনেছেন, কুমিল্লা সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে নিরীহ লোকদের ধরে এনে পিটিয়ে মারার সময় সেই সমস্ত হতভাগ্য মানুষের বুক ফাটান আর্ত চিৎকারে। তিনি দেখেছেন গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার নারকীয় দৃশ্য।

এন্থনী ম্যাসকারণহাস বাংলাদেশ সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখছেন যে, ১৯৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল ঢাকা সফরকালে আমি ইকবাল হলের কড়িডোরে ৪টি ছাত্রের মাথা দেখতে পাই। কেয়ার টেকার আমাকে জানায় যে, তাদেরকে ২৫শে মার্চ রাত্রে হত্যা করা হয়েছিল। ঐ হলেরই দুটো সিঁড়িতে এবং ৪টি কামরায় প্রচুর রক্তের দাগ দেখি।

মেঝেতে এবং সিঁড়িতে প্রচুর ডিডিটি ছড়ান সত্বেও চাপ চাপ রক্তের মধ্যে থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। হলের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন জানাল যে, কয়েক ঘণ্টা আগে ঐ এলাকা থেকে ২৩টি নারীর গলিত দেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৫শে মার্চের পর থেকে মৃত দেহগুলো সেখানে জড়ো করা অবস্থায় ছিল।

এন্থনী স্মৃতিচারণ করছেন, ১৯শে এপ্রিল, সকাল বেলা। কুমিল্লা শহরের সামরিক আইন পরিচালক মেজর আগার অফিসে বসে আছি। এমন সময় জনৈক বিহারী পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর বন্দীদের একটি তালিকা এনে মেজর আগার হাতে দিল। মেজর আগা তালিকাটি হাতে নিয়ে দেখল তারপর চারটি নামের পার্শ্বে হাতের পেন্সিল দিয়ে টিক মার্ক দিল। 'এই চারজনকে আজ বিকেলে আমার কাছে হাজির করবে' বলল মেজর আগা। তারপর আরেকটি নামের পার্শ্বে টিক মার্ক দিয়ে বলল, 'এই চোরটাকেও হাজির করবে এদের সাথে।'

বলাবাহুল্য এটা হল ঐ ৫ জন হতভাগ্যের মৃত্যু দণ্ডাদেশ এবং এ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করল মেজর তার হাতের ডাব নারিকেলের পানি খেতে খেতে। পরে আমি জানলাম এই ৫ জনের দুইজন হল হিন্দু, তৃতীয় ব্যক্তি একজন ছাত্র, চতুর্থ ব্যক্তি আওয়ামী লীগ কর্মী এবং ৫ম ব্যক্তি যাকে মেজর চোর হিসেবে আখ্যায়িত করল, সে তার কোন এক হিন্দু বন্ধুর জিনিসপত্র নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিল নিরাপত্তার জন্য।

বিকেলে আমি দেখলাম হাত পা বাঁধা এই ৫ হতভাগাকে সার্কিট হাউজের সামনে এনে ফেলে রাখা হয়েছে। তারপর এল সেই যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত, সন্ধ্যা ৬টার কিছু পর কার্ফু বলবত করা হয়েছে, আমি শুনতে পাচ্ছি শক্ত কাঠ দিয়ে মানুষ মারার শব্দ এবং সেই ৫ হতভাগ্যের জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সমানে কাঠ দিয়ে মারা হচ্ছে। শালিকরা গাছের ডালে কিচিরমিচির করছিল মানুষ মারার শব্দে, তাদের কণ্ঠস্বরও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

এন্থনী ম্যাসকারণহাস বলছেন, কুমিল্লা জেলা হল বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর অন্যতম। সেখানকার প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজার ৯শ' লোকের বাস। কিন্তু আমরা কোন লোকই দেখতে পেলাম না। কয়েকদিন আগে ঢাকাতে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'বাঙ্গালীরা কোথায় গেছে?' তাদের স্বভাবসিদ্ধ উত্তর দিয়েছিল, 'তারা গ্রামের দিকে চলে গেছে।' অথচ এই পল্লী অঞ্চলেও কোন বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পেলাম না। ঢাকার মত কুমিল্লা শহরের দোকানপাট, ঘর-দরজাগুলোও বদ্ধ অবস্থায় স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কুমিল্লা থেকে লাকসাম যাওয়ার ১০ মাইল রাস্তার দুধারের গ্রামগুলোও জনমানবশূন্য দেখলাম আর এপথের দুধারে যে ক'জন কৃষক দেখলাম তাদের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়। তবে দেখলাম অগণিত পাকিস্তানের সৈন্য। হাতে সবার অটোমেটিক রাইফেল। অর্থাৎ যেখানে সৈন্য আছে সেখানে বাঙ্গালী নেই।

বেতার ও সংবাদপত্রে ক্রমাগত বলা হচ্ছে, যদি কেউ রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথচ রাস্তা কিংবা সেতু ধ্বংস করে তাহলে তাকে ধরতে পারলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং বেরিকেড সৃষ্টির অথবা ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর ১শ গজের মধ্যকার ঘরবাড়ী সব ধ্বংস করে দেয়া হবে। কিন্তু হাজীগঞ্জ যাওয়ার ১৫ মাইল আগে দেখলাম একটি বিধ্বস্ত সেতু, সেটি মাত্র গতরাত্রেই বিদ্রোহীরা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আর পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মত্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

চাঁদপুর থেকে হাজীগঞ্জ যাওয়ার পথে আরেকটি ঘটনার সম্মুখীন হলাম আমরা। এক রাস্তার মোড়ে এসে দেখলাম, একটি মসজিদের পার্শ্বে একটি সামরিক কনভয় দাঁড় করান রয়েছে। ট্রাকগুলোর সংখ্যা হবে সাত। প্রত্যেকটা সশস্ত্র সৈন্য বোঝাই। একেবারে সামনেরটা একটি জীপ। দেখলাম দুইজন সামরিক পোশাক পরিহিত লোক প্রায় শতাধিক বন্ধ দোকানপাটের দিকে তাকাচ্ছে এবং এক একটা দোকান খুলবার চেষ্টা করছে। অপর একজন তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করছে। আমাদের সঙ্গী মেজর রেথর তার টয়োটা সেখানে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি করছ এখানে?' পর্যবেক্ষণকারী সামরিক লোকটি উত্তর দিল– 'তুমি কি ভাবছ যে আমরা চুরি করছি?' মেজর রেথর চিনতে পারল তাকে এবং আমাকে বলল সে হচ্ছে তার পুরাতন বন্ধু 'ইফতি' – ১২শ' ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেলের মেজর ইফতিখার। রেথর বলল, 'আমি ভাবছিলাম বুঝি কেউ লুটপাট করছে।' লুটপাট? না তা নয়, আমরা মানুষ মারছি আর আগুন লাগাচ্ছি, মেজর ইফতিখার উত্তর করলো। রেথর জিজ্ঞেস করল, 'কতগুলো সাবাড় করলে' ইফতিখার পরিতৃপ্তির হাসি ওষ্ঠে টেনে উত্তর করল, 'মাত্র ১২টা।' এবং এখন চলছে তার অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ আগুন লাগানোর কাজ।

এন্থনী ম্যাসকারণহাস বলছেন, আমি দেখলাম একটি বন্ধ করা দোকানের কপাট ভেঙ্গে ফেলা হল। সে দোকানে থরে থরে সাজান রয়েছে পেটেন্ট ঔষধ, কপ সিরাপ, স্কোয়াস। মেজর ইফতিখার সেগুলো লাথি মেরে ভুলুণ্ঠিত করল এবং দোকানের এক কোণে পড়ে থাকা একটা চট টেনে এনে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ঘরের এককোণে টাঙ্গান একটি ছাতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জনৈক জোয়ান। সে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে ছাতাটি আনতে গেলে মেজর তাকে ধমক দিয়ে ফেরত পাঠান। ততক্ষণ আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র বাজারকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

পরদিন মেজর ইফতিখারের সাথে এন্থনীর আলাপ হয়। মেজর জানালো যে, তার হাতে মাত্র ৬০টি ঘর পুড়েছে। এটা যদি ব্যাকাল না হত তাহলে অনেক হত্যাযজ্ঞ ও অগ্নিকাণ্ড তার একার হাত দিয়ে সংগঠিত হতে পারত বলে ইফতিখার জানাল। এক সময় মেজর জানান যে, তারা একবার এক বুড়োকে ধরেছিল। বুড়োকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে বলল যে, সে একজন মুসলমান, এমনকি তার নাম পর্যন্ত বলল আবদুল মান্নান। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল, সে মুসলমান নয়। মেজর বলল, 'আমি সাথে সাথে তাকে শেষ করে দিতে চাইলাম কিন্তু আমার সঙ্গীরা জানালো তাকে ৩টি গুলী করার দরকার হবে। সুতরাং প্রথম গুলীটা মারলাম পেটে, দ্বিতীয়টা বুকে, তৃতীয়টা মাথায়।'

লাকসামের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। লাকসাম থেকে জনৈক পাকিস্তানী ক্যামেরাম্যান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তাই দেখবার জন্য একটা ছবি নিতে চাইলেন। সেখানকার জনৈক মেজর বললেন এটা খুব কষ্টের ব্যাপার নয়। এটা ২০ মিনিট সময়ের মধ্যে ব্যাপার। ৩৯ বেলুচ রেজিমেন্টের লেঃ জাবেদকে এর দায়িত্ব দেয়া হল। জাবেদ সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল হক নামে জনৈক মওলানাকে ডেকে আনলে মওলানা জানালেন তাকে ২০ মিনিট সময় দিলে ৬০ জন এবং দুইঘণ্টা সময় দিলে ২০০ লোক নিয়ে আসতে পারবেন। যাই হোক, বেশী সময় যেতে না যেতেই দেখা গেল মওলানা কমপক্ষে ৫০ জনের মত ছেলে বুড়োকে ধরে নিয়ে এসেছেন। সবার মুখে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাক আর্মী জিন্দাবাদ ইত্যাদি। সেখানে একটা জনসভার ব্যবস্থা করা হল। মাহবুবর রহমান নামে জনৈক আগন্তুক বক্তৃতা করতে উঠে পাক আর্মীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন, তিনি নিজেকে এন এম কলেজের অধ্যাপক বলে পরিচয় দিলেন। 'জনসভা' শেষ হলে স্থানীয় মেজরকে আমি জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, উদ্দেশ্যে হাসিল হয়েছে। অধ্যাপক সম্পর্কে মেজরের মন্তব্য হল, 'জারজটাকে আমি লিস্টের অন্তর্ভুক্ত করলাম।'

বাংলাদেশের বুকে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী কত বর্বরোচিতভাবে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেছিল, তার ছোট্ট একটি নজীর দিচ্ছেন পাকিস্তানী সাংবাদিক এন্থনী ম্যাসকারণহাস। বালুচ-রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন দূররাণীর উপর ছিল কুমিল্লা এয়ারপোর্ট রক্ষার দায়িত্ব। ক্যাপ্টেন দূররাণীর ভাষায়– 'আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিয়েছি এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ার রক্ষায় নিযুক্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে কোন সন্দেহজনক কাজকর্ম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাদেরকে গুলি করা হয়।' কয়েকদিন আগে এক রাতে জনৈক ব্যক্তিকে এয়ারপোর্টের দিকে আসতে দেখা গেছিল কিন্তু তাকে আর আসতে হয় নি। সাথে সাথেই গুলী করা হয়। কেন তাকে মারা হয় এ প্রশ্নের জবাব দূররাণীর তরফ দেয়া হয়, 'সে একজন বিদ্রোহী হতে পারে।'

দূররাণীকে আবার প্রশ্ন করা হল তার নিজের হাতে কত বাঙ্গালী মরেছে। সদর্পে ক্যাপ্টেন দূররাণী জানান যে, '৬০ জনের কিছু বেশি লোক।'

[বাংলার বাণী পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে গণহত্যা' শীর্ষক বিশেষ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

মুক্তিযুদ্ধে সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এদেশের বিভিন্ন শ্রেণি- পেশার মানুষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষেরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এদের কেউ কেউ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, কেউ আবার অভিনয়শৈলী দিয়ে অর্থ উপার্জন করে বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। আবার কেউ তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে, কেউ মহান মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা হিসেবে হাতে রংতুলির কৃপাণ নিয়ে, কেউ প্রেরণাদায়ী গান লিখে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করতে অবদান রেখেছেন।

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ও সম্প্রসারণে দেশমাতৃকার রক্ষাযুদ্ধে প্রেরণাদায়ক অনেক গান, কবিতা, জীবনন্তিকা, কথিকা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক-নাটিকা, যাত্রাপালা, চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে– যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকমণ্ডলী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার তথা সংস্কৃতিকর্মীদের অবদান প্রাতঃস্মরণীয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানিরা গণহত্যা শুরু করলে বাংলাদেশ থেকে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষজন দেশ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। সেসময় সীমান্তসংলগ্ন রাজ্যগুলোর শিল্পী-লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সর্বান্তকরণে বাংলাদেশের আশ্রয়হীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি ও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও বিভিন্ন ব্যক্তি-সংগঠনের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে সহায়তা করেছিলেন। ভারতের কবি-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, সাংবাদিকেরা বাংলাদেশের শরণার্থী ও সংস্কৃতিকর্মীদের থাকার জায়গা করে দিয়েছিলেন। আবার অনেককে নিজেদের বাসায় আশ্রয় দিয়েছেন।

জন্মভূমির মুক্তি অর্জনে আত্মোৎসর্গ করার নির্ভীক চেতনাকে শাণিত করতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। শুধু ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধই নয় ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬৬-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানসহ সকল রাষ্ট্রীয় সংকটে সংস্কৃতিকর্মীরা ছিল অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় সদাজাগ্রত। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীরা নানা ধরনের দেশাত্মবোধক গান, গণসংগীত, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, যাত্রাপালা, অনুপ্রেরণাদায়ী কবিতার তেজোদীপ্ত বাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাঙালির মন ও মনন।

কবিরা কবিতার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ ও চেতনা বৃদ্ধি করত আর গানে করত প্রাণিত-শানিত। তেমনি নাটকও জুগিয়েছিল অদম্য সাহস। যুদ্ধকালীন এসব নাটক মুক্তির স্বপ্নে বিভোর বাঙালিদের উজ্জীবিত করে। বেশির ভাগ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে যোগ করেছে দেশপ্রেমের এক স্বাতন্ত্রিক মাত্রা। মঞ্চনাটকের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছে বহু পথনাটক। সেসময় অকুতোভয় নাট্য ও সংস্কৃতিকর্মীরা পথে-প্রান্তরে এমনকি ট্রাকে করে পথে পথে ঘুরে তেজোদীপ্ত সংলাপ আর কবিতা-গানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জ্বালাময়ী গান ও চরমপত্র পুরো জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট করেছিল বিজয়ের স্বপ্ননেশা। বাংলাদেশের কবিকুলের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল স্পষ্ট। ফলে কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে নানাভাবে। চিত্রকলা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে প্রণোদনাদানকারী অন্যতম একটি উপাদান।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকুশলীরা কালুরঘাটে স্থাপন করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। পরবর্তীতে এ বেতার কেন্দ্রের নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে ২৫শে মে কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, নাট্যশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, যন্ত্রশিল্পীসহ অন্যান্য শিল্পীরাও এখানে নানা পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চরমপত্র, মুক্তিযুদ্ধের গান, সংবাদ, কথিকা, রণাঙ্গনের সাফল্যগাথা, বজ্রকণ্ঠ, নাটক, গীতি আলেখ্য পরিবেশন ইত্যাদি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল 'চরমপত্র' পাঠ। এম আর আখতার মুকুল উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠানে পুরান ঢাকার আঞ্চলিক (কুট্টি) ভাষায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে ব্যঙ্গ করে হাস্যকরভাবে উপস্থাপন করা হয় এই চরমপত্র। এর পরিকল্পনায় ছিলেন আবদুল মান্নান। কল্যাণ মিত্রের পরিচালনায় পরিবেশিত হতো 'জল্লাদের দরবার'। যেখানে ইয়াহিয়া খানকে 'কেল্লা ফতে খান' হিসেবে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। 'বজ্রকণ্ঠ' অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অংশবিশেষ সম্প্রচার করা হতো; যা বাঙালি জাতিকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করত।

মুক্তিযুদ্ধকালীন আরও যেসব কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে নিরলসভাবে কাজ করেন তারা হলেন– জিল্লুর রহমান, ড. আনিসুজ্জামান, আতাউর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, কল্যাণ মিত্র, কামাল লোহানী, আবদুল জব্বার খান, সৈয়দ হাসান ইমাম, কবি নির্মলেন্দু গুণ, জহির রায়হান, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সোহেল রানা, চাষী নজরুল ইসলাম, আলী যাকের প্রমুখ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করার জন্য গান পরিবেশন করেছেন কণ্ঠশিল্পী আপেল মাহমুদ, সমর দাস, ইয়ার মোহাম্মদ, অরুণ গোস্বামী, রথীন্দ্রনাথ রায়, মলয় গাঙ্গুলী, মান্না হক, লাকী আখন্দ, মিতালী মুখার্জী, তিমির নন্দী, রফিকুল আলম প্রমুখ শিল্পীরা।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা এবং চিত্রনাট্যকার আবদুল জব্বার খান মুজিবনগর সরকারের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও পরিবেশনার সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের আরেক প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার জহির রায়হান ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র *জীবন থেকে নেয়া*-এর বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয় এবং চলচ্চিত্রটি দেখে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা এবং ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ গুণীজন ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেসময় তিনি তাঁর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করেন।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার, কাহিনিকার, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক ও মুক্তিযোদ্ধা খান আতাউর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর তৈরি করেন *আবার তোরা মানুষ হ*; যার বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতা। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের উপর ১৯৯৪ সালে তিনি *এখনো অনেক রাত* নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভিনেতা ও আবৃত্তিকার সৈয়দ হাসান ইমামকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় শিল্পীদের প্রতিবাদী সংগঠন বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ। যাঁরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান বর্জন করেন। গণ-আন্দোলনের চাপে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ৮ই মার্চ থেকে বেতার টেলিভিশনের দায়িত্ব বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ২৫শে মার্চের পর হাসান ইমাম মুজিবনগর চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাট্য বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। সৈয়দ হাসান ইমাম মুজিবনগর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সালেহ আহমেদ নামে বাংলায় সংবাদ পাঠ করতেন। তিনি ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সংবাদ পাঠ এবং নাট্য বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জহির রায়হানকে সভাপতি ও হাসান ইমামকে সাধারণ সম্পাদক করে মুজিবনগরে চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি গঠন করা হয়। যাদের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র দলিল *লেট দেয়ার বি লাইট*' নির্মিত হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা সংগীত জয় বাংলা বাংলার জয়-এর রচয়িতা, নির্মাতা, নির্দেশক, প্রযোজক, গীতিকার ও সুরকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার বাংলা গানের এক জীবন্ত কিংবদন্তি। এছাড়া তিনি 'একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল', 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়' সহ স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম নিয়ে অসংখ্য কালজয়ী গান রচনা করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি স্বাধীন দেশের সর্বপ্রথম পুরস্কার 'বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, লেখক, অভিনেতা আমজাদ হোসেন ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। লেখালেখির মাধ্যমেই তাঁর সৃজনশীল জীবন শুরু হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস ও গল্পও তিনি লিখেছেন। ১৯৭০ সালে মুক্তি পায় তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র *জীবন থেকে নেয়া*।

আরেক স্বনামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র *ওরা ১১ জন* নির্মাণ করেন। তাছাড়া গুণী অভিনেতা খসরু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *ওরা ১১ জন*-এ তিনি দক্ষ অভিনয় নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করেন। চিত্রনায়ক, পরিচালক ও প্রযোজক সোহেল রানা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক *ওরা ১১ জন* চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেন তিনি।

বিখ্যাত সংগীতশিল্পী আবদুল জব্বার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত 'সালাম সালাম হাজার সালাম'-এর মতো অসংখ্য উদ্বুদ্ধকরণ গানের গায়ক হিসেবে বেশি পরিচিতি পান। বাংলাদেশের বিখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ১৯৭০-এর দশকের শেষলগ্ন থেকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও সংগীতশিল্পে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। গুণী অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ, আলী যাকের প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের আরেক সাংস্কৃতিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র গেরিলা ও একাত্তরের যিশু নির্মাণ করেন।

চিত্রশিল্পী হিসেবে যোদ্ধার মতো যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ও মুক্তিকামী জনতাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। যুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায়ও তাঁর তুলি থেমে থাকেনি। এঁকে গেছেন একের পর এক চিত্র। তাঁর *শরণার্থী* নামের ছবিতে দেখা যায় ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে সীমান্তের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার চিত্র। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অমানবিক নির্যাতন ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জীবন্ত চিত্র, বাংলার মানুষের অসহায়ত্বের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রংতুলির মাধ্যমে। 'মুক্তিযুদ্ধ' নামক স্কেচে ফুটে উঠেছে রাইফেল হাতে চোখে-মুখে বিজয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে মুক্তিযোদ্ধাদের এগিয়ে চলার চিত্র।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণাদানকারী শিল্পীদের মধ্যে যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তিনি হলেন পটুয়া কামরুল হাসান। তিনি অনুভব করেছিলেন একমাত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কামরুল হাসান পশ্চিমবঙ্গে চলে যান এবং নবগঠিত মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি দিয়ে একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শিরোনামে। সেখানে দানব আকারে দেখানো হয় ইয়াহিয়া খানকে; যা প্রকৃত অর্থে পুরো হানাদার বাহিনীর নগ্ন চরিত্রের পরিচয় বহন করে। সেই চিত্রটি দিয়ে সেসময় পোস্টার ছাপিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই পোস্টার চিত্রটি পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর এবং তাদের এদেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্রোহের উদ্রেক বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এ ধরনের আরও অনেক পোস্টার তিনি এঁকেছিলেন। তাঁর এমন একটা পোস্টারের উপরিভাগে স্লোগান লেখা ছিল– 'রক্তের ঋণ রক্তে শুধবো, দেশকে এবার মুক্ত করবো।' এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তর থেকে তাঁর 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো', 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো', 'মুক্তিবাহিনী আপনার পাশেই আছে' নামক পোস্টারগুলো প্রচার করা হয়। তাঁর এসব চিত্রকর্ম মুক্তিযোদ্ধাদের ভীষণভাবে মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে অবস্থানরত শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের কিছু দুর্লভ চিত্রকর্মের মধ্যে অন্যতম হলো– কথাশিল্পী শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'জাহান্নাম হতে বিদায়'-এর জন্য বেশ কিছু স্কেচ, যা ছিল খুবই অসাধারণ। এই স্কেচগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা, নারী নির্যাতন, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকায় অবরুদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের নয় মাস আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করেছেন প্রতিটি মুহূর্তে। এ ভাবনা থেকেই আঁকেন 'বিজয়' নামের চিত্রটি। ১৯৭১ সালের আগস্টে এই চিত্রটির কাজ শুরু করেন আর শেষ করেন ১৬ই ডিসেম্বরে। এই ছবিটিতে বিজয়ের মাহাত্ম্য বোঝাতে প্রতীক হিসেবে হাতির প্রতিকৃতি ব্যবহার করেন। হাতে আঁকা ছবি যে প্রতিবাদের বড়ো হাতিয়ার হতে পারে এবং অসামান্য অবদান রাখতে পারে চিত্রকর্ম 'বিজয়' তারই প্রমাণ বহন করে।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী আমিনুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধে অগণিত শহিদ নরনারীর নির্মম নারকীয় হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'গণহত্যা' শিরোনামে একটি বড়ো তৈলচিত্র নির্মাণ করেন। যাতে দেখা যাচ্ছে অগণিত নরনারীর কঙ্কাল স্তূপকৃত হয়ে আছে। উপরের দিকে বাংলার সবুজ-শ্যামল পটভূমি দেখে মনে হয় শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশ বিলাপ করছে।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণাদায়ী চিত্র এঁকে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করতে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– শিল্পী বীরেন সোম, প্রাণেশ মণ্ডল, বরুণ মজুমদার, বিজয় সেন, হাসি চক্রবর্তী, দেবদাস চক্রবর্তী, চন্দ্র শেখর দে, নাসির বিশ্বাস, গোলাম মোহাম্মদ, অঞ্জন বণিক, কাজী গিয়াস উদ্দিন, মর্তুজা বশির, কাইয়ুম চৌধুরী, নিতুন কুণ্ডু, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, রঞ্জিত নিয়োগী, আবুল বারাক আলভী ও স্বপন চৌধুরী প্রমুখ।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরাও। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল সমগ্র বিশ্বে। নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০,০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিটলস ব্যান্ডের লিড গিটারবাদক জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় প্রখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর কর্তৃক সংগঠিত হয় দুটি কনসার্ট। সুর সাধক আলী আকবর খান, আল্লারাখা খান, কমলা চক্রবর্তী, বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, জিম কেল্টনার, লিয়ন রাসেল, ব্যাড ফিঙ্গার, রিঙ্গোস্টার, ক্লস ভোরম্যানসহ বিশ্বের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীরা এই কনসার্টে অংশ নিয়েছিল। এই কনসার্টের মাধ্যমে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কানে পৌঁছে দেয় বাঙালির উপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের ঘটনা।

মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর কাব্যে ফুটে ওঠা বাঙালির দুর্দশা মুক্তিযুদ্ধে আলোড়ন তুলেছিল। তিনি কবিতার মাধ্যমে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর লেখা কবিতার নাম 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। এ কবিতার সূত্র ধরে ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী মৌসুমী ভৌমিকের গাওয়া গান 'যশোর রোড' তৎকালে বাঙালির মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে।

মুক্তিযুদ্ধের গানগুলো যেমনি মুক্তিকামী বাঙালিদের অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তেমনি কোনো কোনো গান নিয়ে গেছে অসহায় শরণার্থী শিবিরে। এই অসাধারণ সব গানই ছিল বাঙালির সাহস আর এগিয়ে চলার মূল উৎস। সেসময় এই গানগুলোই অস্থির মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই ভেবে যে– বাঙালিরা প্রাণপণ যুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে, মুক্তি একদিন আসবেই, বিজয় আমাদের হবেই হবে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিকর্মীদের পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতিকর্মীগণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন দিক থেকে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ এর জুন-জুলাইয়ে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন গভর্নর ইয়ার জং বাহাদুরের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে বোম্বেতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যে অনুষ্ঠানে ভারতের বিখ্যাত কবি ও গীতিকার কাইফি আজমি, তাঁর কন্যা চলচ্চিত্রশিল্পী শাবানা

আজমি, অভিনেতা দিলীপ কুমার, কণ্ঠশিল্পী মোহাম্মদ রফি, নার্গিস দত্ত ও ওয়াহিদা রহমান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ তহবিলে প্রদান করা হয়েছিল। তাছাড়া সেসময় বোম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিও (বলিউড) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কনসার্টের আয়োজন করে কয়েক লাখ টাকা আয় করে বাংলাদেশ তহবিলে জমা দিয়েছিল।

প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী অংশুমান রায়ের কণ্ঠে 'শোন একটি মুজিবুরের থেকে লক্ষ মুজিবুরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি...' এবং খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া 'মাগো ভাবনা কেন...' বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। গান দুটো লিখেছেন কিংবদন্তি গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। শচীন দেব বর্মণের 'বাজে টাকডুম টাকডুম বাজে, বাংলাদেশের ঢোল...' এবং শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা' সেসময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রমুখ সংস্কৃতিকর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমানো লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে খাবার-পানীয় ও আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদান করার পাশাপাশি আশ্রিতদের সাহসও জোগাতেন।

১৯৭১-এর এপ্রিলে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতে শরণার্থী বাংলাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন, গঠন করেন মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি। এর সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, কবি অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ। এছাড়াও পৃথিবী বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক তৈরি করেছিলেন *দুর্বার গতি পদ্মা* নামক চলচ্চিত্রটি, যার থেকে অর্জিত সমুদয় অর্থও বাংলাদেশ তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছিল।

সংস্কৃতিকর্মীদের অবদান শুধু মুক্তিসংগ্রামেই নয়, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর দেশগঠনেও ভূমিকা পালন করেছে ও করছে। সংস্কৃতিককর্মীদের অবদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছে সেই সময়ে। এই অবদান মুক্তিযুদ্ধকালীন এমনকি বর্তমান সময়েও বহমান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান শুধু যুদ্ধাবস্থায় নয়; সবসময় দেশ গঠনেও জাতিকে উজ্জীবিত করে আসছে। দেশপ্রেমের চেতনাবাহী গান আজও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগায়। এ গানের সুর ও বাণীর শক্তি এতই ব্যাপক ও শক্তিশালী যে, তা জীবনকে তুচ্ছ করার সাহস ও শক্তি জোগায়। এ শক্তি নিরন্তর বহমান থাকে চেতনায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এ অসীম শক্তি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনে সহায়ক হয়েছিল। মুক্তিসংগ্রামে সাংস্কৃতিক শক্তির ভূমিকা অপরিসীম। সংস্কৃতিককর্মীর মাধ্যমে এই মুক্তির চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী হোক সব বাঙালি।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহযোগী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

বস্ত্রখাতে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পেল ১১ প্রতিষ্ঠান

বস্ত্রখাতের উন্নয়ন, উৎকর্ষ সাধন, বস্ত্র শিক্ষার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় সম্মাননা পেল ১১টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক। মন্ত্রী বলেন, বস্ত্রখাতের সক্ষমতাবৃদ্ধি, যুগোপযোগীকরণ ও বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিবছর ৪ঠা ডিসেম্বর 'জাতীয় বস্ত্র দিবস' দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসময় বস্ত্র ও পাট সচিব মো. আব্দুর রউফ, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. নূরুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'স্মার্ট টেক্সটাইলে সমৃদ্ধ দেশ-বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের অর্থনীতিতে 'বস্ত্রখাত' দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। সরকার বস্ত্রখাতের অংশীজনদের সাথে সমন্বয় করে এ খাতের উন্নয়নকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি বস্ত্র অধিদপ্তর পোষাক কর্তৃপক্ষের সকল সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিস-এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে প্রদান করছে। বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকশিত করার নিবন্ধিত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে তৈরি পোশাকশিল্পে উন্নতমানের ২০৬টি সবুজকারখানার (গ্রিনফ্যাক্টরি) নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ।

২৭শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) বস্ত্র দিবসে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। সম্মাননা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস অ্যান্ড পাওয়ারলুম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (বিএসটিএমপিআইএ), বাংলাদেশ কটন অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ), বাংলাদেশে গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ), বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স), বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ), বাংলাদেশ এমব্রয়ডারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমইএ) এবং বাংলাদেশ তাঁতি সমিতি।

প্রতিবেদন: কে এম আশরাফুল

মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

কামরুন-নাহার-মুকুল

বাংলার প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ দেশের নারী সমাজের ভূমিকা অনন্য। কৃষক বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, নাচোল বিদ্রোহ এমনকি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও নারী সমাজ পিছিয়ে থাকেনি। সে কারণেই দেবী চৌধুরানী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, নবাব ফয়জুন্নেসা এবং ইলা মিত্রের মতো অসংখ্য মহীয়সী নারী ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। তেমনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীদের ছিল বীরত্বপূর্ণ অবদান।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত একটি প্রতীকী চিত্রকর্ম একজন নারী রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে, লেখা রয়েছে 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা।' ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় সংসদের বৈঠক বাতিল হলে ক্লাস বর্জন করে ছাত্ররা রাস্তায় নামে। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ছিল 'রোকেয়া হল' নামে একটি মাত্র হল। ৭ই মার্চের সমাবেশে রোকেয়া হলের সাড়ে তিনশো মেয়ের বিশাল মিছিলের বহরটি টিএসসি দিয়ে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশ করে। বদরুন্নেসা কলেজ, হোম ইকোনমিকস্ কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেয়ে সেদিন সে সমাবেশে উপস্থিত হন; এরাই ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী। মশারির স্ট্যান্ড, লাঠি আর ফেস্টুন হাতে উত্তপ্ত স্লোগানে মুখরিত থাকলেও জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের সময় ছিল পিনপতন নীরবতা। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের বৈশিষ্ট্য– নেতৃত্বের সর্বোচ্চ দেশাত্মবোধ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির এবং লক্ষ্য অর্জনের স্পষ্ট নির্দেশনা। বাঙালি জাতির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু আশ্চর্য ম্যাজিশিয়ান। আবার এ দেশের মানুষের মনকে একবার জাগিয়ে তুলতে পারলে কীরকম আপোশহীন হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণও উনিশশো একাত্তর।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকেই স্বাধীনতাকামী ছাত্রদের মতো রোকেয়া হলের ছাত্রীরাও বেশ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। নারী সংগঠনগুলোর পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে সশস্ত্র ছাত্র বিগ্রেড গড়ে তোলা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ছাত্রীদের নেতৃত্বে বিগ্রেড পরিচালিত হতে থাকে। বিগ্রেড পরিচালনায় মেয়েরাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ছেলেদের আগেই রোকেয়া হলের মেয়েরা প্রশিক্ষণ শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে; সচেতন ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য। শত্রু মোকাবিলার অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়; ডামি রাইফেল নিয়ে অর্থাৎ কাঠের বন্দুক হাতে নিয়ে বহু ছাত্রী অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণ ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। সেখানে মার্চপাস্ট থেকে শুরু করে রোলিং, রেকি সবই শিখানো হয়। 'আলাপ আলোচনা করে সমস্যার সমাধান হবে না। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই দেশ স্বাধীন করতে হবে'– দেশের মানুষের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলার দামাল মেয়েরা ঢাকার রাস্তায় প্রদর্শনীমূলক মার্চপাস্ট করে নগরীর বিভিন্ন সড়ক অতিক্রমকালে সাধারণ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর শুরু হলো নানা ষড়যন্ত্র, প্রতারণা আর টালবাহানা। সুপরিকল্পিতভাবে গোপনে তৈরি করল বাঙালি নিধনযজ্ঞের ব্লু প্রিন্ট। ২৫শে মার্চ বিকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এর আঁচ পড়েছিল রোকেয়া হলেও। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর একটা বড়ো কিছুর আশঙ্কায় হল ত্যাগ করেন প্রায় সব ছাত্রী। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের দীপ্ত শপথে বলীয়ান সাত ছাত্রী হলে থেকে যান; তাছাড়া এরা ছিলেন সবাই পরীক্ষার্থী। হলের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দেরও অনেকে সপরিবার রয়ে যান। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সূচনা হলে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপকবৃন্দ। শহিদ হলেন বুদ্ধিজীবীরা। দেশকে মেধাশূন্য করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ছাত্রীদের একমাত্র আবাসিক 'রোকেয়া হল'ও সেই রাতে পাকিস্তানি হায়েনাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। তাদের অন্যতম টার্গেট ছিল রোকেয়া হল। কারণ, এই হলের মেয়েরা শত্রু মোকাবিলার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছে, ডামি রাইফেল হাতে কুচকাওয়াজ করেছে। সেই ফটোগ্রাফ আজ দুর্লভ নয়। এ খবর পৌঁছে যায় পাকিস্তানি সেনাদের কাছেও। হায়েনারা হলে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। প্রভোস্টের নির্দেশে হলে অবস্থানরত সাত ছাত্রীকে হাউজ টিউটর সাহেরা খাতুন নিজ কোয়ার্টারের স্টোর রুমে নিরাপদে লুকিয়ে রাখেন। হলের প্রভোস্ট এবং হাউজ টিউটরের বুদ্ধিমত্তার জন্য তারা প্রাণে রক্ষা পান। ২৬শে মার্চ ঢাকা শহরে কারফিউ, ২৭শে মার্চ সান্ধ্য আইন শিথিল হলে প্রভোস্টের সহায়তায় তারা হলের পেছন থেকে বেরিয়ে পড়েন। এই সাত ছাত্রী সেদিন বেঁচে গেলেও বাঁচতে পারেনি হলের কর্মচারী ও তাদের পরিবার-পরিজন; পাকিস্তানি হানাদাররা তাদেরকে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। রোকেয়া হলের পেছনের অংশ বর্তমান শামসুন্নাহার হলের গেট, সেই সময়ের ঐ পরিত্যক্ত স্থানে শহিদদের মাটিচাপা দিয়ে তার ওপর ট্রাক চালিয়ে দেয় হানাদাররা।

২৫শে মার্চ রাত দেড়টা- দুটার দিকে হায়েনার দল বাইরের গেট ও দরজা ভেঙে হামলা করেছিল হলের প্রভোস্ট মিসেস আখতার ইমামের বাড়িতেও। সবাইকে লাইন করিয়ে বলেছিল, 'তোমারা আফসার লে আও'। মিসেস আখতার ইমাম এখানের সবচেয়ে বড়ো অফিসার বললেও তারা বিশ্বাস করেনি। একজন মহিলা এত বড়ো একটি হলের প্রধান হতে পারেন, এটা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি। নরপশুরা তাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছে– 'লাড়কি কাঁহা, লাড়কি কো লে আও'। হলে তখন সাতজন ছাত্রী অবস্থান করলেও প্রভোস্ট বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় মেয়েরা বাড়ি গেছে। বার বার দৃঢ়তার সাথে একই উত্তর দেওয়ায় প্রভোস্টের কথাই তারা বিশ্বাস করে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি দেশের সেনাবাহিনী সেই দেশেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হলেও আক্রমণ চালাতে পারে এমন নজির ইতিহাসে নেই। বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী সেই জঘন্যতম লজ্জাজনক কাজটিও করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ পার করেছে ৫২ বছর। অনেক স্মৃতি রয়েছে অলিখিত। অনেক স্মৃতিই তলিয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে। গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনার যথাযথ আর্কাইভও হয়নি। সেলফির যুগ ছিল না; ছিল না মোবাইল ফোন। যুদ্ধের সময় ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল অফিস থেকে দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্টে তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে যেসব রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল সেগুলোর একটি অংশ ২০০২ সালে প্রকাশ করা হয়। স্টেট ডিপার্টমেন্টই এগুলো প্রকাশ করে 'যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিল' হিসেবে। ওইসব দলিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের কিছু বিবরণ ফুটে উঠেছে।

পরবর্তীতে ২৫শে মার্চ হলে অবস্থানরত ঐ সাত ছাত্রীর কেউ সীমান্তের ওপারে গিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কেউ বাংলাদেশের ফিল্ড হাসপাতালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত হন। ঘটনাচক্রে একজনকে কুষ্টিয়া জেলা সামরিক আইন প্রশাসনের কার্যালয়ে টাইপিস্ট হিসেবে চাকরি নিতে হয়। তিনি সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুক্তিবাহিনীর জন্য গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মতো দুঃসাহসী কাজটিও করেন। প্রতিদিন, প্রতিটি তথ্য পাচারের ঘটনাই ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। ঐ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রীরা সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলায় যান। সেখানে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের কাছে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন; মহিলা গেরিলা স্কোয়াডের নেতৃত্বে ছিলেন ঐ সময়ের রোকেয়া হলের ছাত্রলীগ শাখার নেত্রী ফোরকান বেগম। তার নেতৃত্বে গেরিলা স্কোয়াড গড়ে উঠেছিল। প্রথমে দলে ছিলেন আট জন; তারা অস্ত্র প্রশিক্ষণ করেছেন। এরপর শতাধিক নারী এসেছেন। তাদেরকে সুইসাইড স্কোয়াডের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেত্রী সশস্ত্র ট্রেনিংয়ে অংশ নেন। তখন কলকাতায় একমাত্র মহিলা মুক্তিযুদ্ধ ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপিত হয়। এ ট্রেনিং ক্যাম্পটি গোবরা ক্যাম্প হিসেবে পরিচিত। আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় 'গোবরা ক্যাম্প' চালু হয়েছিল এবং তিনিই ক্যাম্পটি পরিচালনা করতেন। ঐ ক্যাম্পে মোট ৪০০ নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তাদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ ছিল দেশের আপামর জনগণের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ শুধু পুরুষরাই করেনি, করেছে নারীরাও। মুক্তিযুদ্ধে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। নারী দুই রকমভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন; প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং পরোক্ষ অংশগ্রহণ। কেউ মুক্তিযুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আবার কেউ রণাঙ্গনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কেউ অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছেন, কেউ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছে, মনোবল জুগিয়েছেন, কেউ বহির্বিশ্বে স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বমত গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। যারা সরাসরি অস্ত্র ধরেছিলেন, তাদের প্রাণ হারানোর আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে বেশি। এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে মুক্তিযদ্ধের পক্ষে যে-কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাওয়াই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি নারীরা কখনও গেরিলা যুদ্ধে, কখনও সম্মুখযুদ্ধে, কখনও সেবিকা হিসেবে, কখনওবা বার্তাবাহক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রেও নারী যোদ্ধাদের অবদান কম নয়। গুপ্তচরবৃত্তির মতো দুঃসাহসিক কাজেও নারীদের অংশগ্রহণ স্বাধীনতার ইতিহাসে গৌরব ও সাফল্য বয়ে এনেছে। নারীরা দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন তা জাতি আজও স্মরণ করে। নারী শুধু শক্তি ও প্রেরণাদাত্রী হিসেবেই কাজ করেনি, পুরুষের পাশাপাশি নারীর তরবারিও ঝলসে উঠেছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের গর্ব ও অহংকারের শেষ নেই। কতজন নারী প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, কীভাবে যুদ্ধ করে শত্রুকে খতম করেছে, শহিদ হয়েছেন– এসব প্রসঙ্গ খুব কমই আলোচনায় আসে। গবেষকরাও এদিকে খুব একটা নজর দেননি। এখনও শুধু নির্যাতনের শিকার নারী বা শহিদ জায়া-জননীর বিষয়গুলোই আসে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদানকে কেবল বীরাঙ্গনা হিসেবে ও শহিদের মা, বোন, স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাঙালি নারীরা শুধু পাকিস্তানি সেনার অত্যাচারের শিকারই হননি, সরাসরি তারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জনযুদ্ধ। নারীরাও কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে

সম্পৃক্ত ছিলেন। সেটা হোক সম্মুখযুদ্ধে কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে কিংবা নিজেদের জীবনযুদ্ধে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অনেক নারী সম্মান হারানোর ভয়ে এখনো নিভৃতে, বিদেশে আত্মগোপন করে বা অসহায়ভাবেই জীবনাবসান করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাতি যখন গভীর সংকটের মোকাবিলা করে, তখন নারীরাই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এর ব্যতিক্রম হয়নি। নারী সমাজেরও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। নারীর যাত্রাপথ সরল নয়; হোক যুদ্ধদিনে বা স্বাভাবিক সময়ে। তাই নারীদের যুদ্ধ যন্ত্রণার পাল্লা অনেক ভারী। হত্যার পূর্বে তাদের ওপর চলেছে হানাদারদের পাশবিক নির্যাতন। ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস অত্যাচার চলে বন্দিশালায় আটকে পড়া নারীদের ওপর; মাসের পর মাস হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর, রাজাকারের হাতে ধর্ষণ ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল। অনেকে গর্ভবতী হন; জন্ম নেয় যুদ্ধ শিশু। স্বাধীনতার পর সমাজ এবং আপনজন অনেককেই গ্রহণ করেনি। অনেকে আত্মহত্যা করেছেন; অনেকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিরুদ্দেশ রয়েছেন। যারা একটি সুন্দর স্বপ্নের জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন, সাহসী হয়েছিলেন, সে সব মুক্তিযোদ্ধাও হারিয়ে গেছেন। কেউ আবার বীরাঙ্গনা হয়ে এখনো বেঁচে আছেন। শহিদ বুদ্ধিজীবী নারীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার পেশার ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিয়োজিত নারীরাও রেহাই পায়নি।

নারীরা কেবল যুদ্ধই করেনি, মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহ প্রেরণাকারী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের নাটক ও সংগীত পরিবেশন করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' কথিকা রচনা ও পাঠের সাথেও নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল। বেতার কেন্দ্রের শুরুর দিকে প্রতি সোমবার সকাল ৭.৩৫ মিনিটে প্রচারিত হতো 'রণাঙ্গনে বাংলার নারী' ও সোমবার ছাড়া প্রতিদিন একই সময়ে 'মুক্তিসংগ্রামে মায়ের ভূমিকা' শীর্ষক কথিকা। কথিকা রচনা ও পাঠে সম্পৃক্ত ছিলেন আইভি রহমান। শাহনাজ বেগমের কণ্ঠে 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা' এরকম অজস্র গানের সুর শুনে মানুষ শিহরিত হয়েছে।

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর থেকে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সব উল্লেখযোগ্য ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে নারীদের উপস্থিতি হয়ত তেমন ছিল না। কিন্তু নারী মা-স্ত্রী-বোন-সহকর্মী-সহযোদ্ধা হিসেবে নীরবে কাজ করে গেছেন। যে যোদ্ধা যুদ্ধে গেছেন, তার পরিবার-পরিজনের ঘর আগলে রেখেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য সরবরাহ করে, অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে, মমতা দিয়ে, সেবা দিয়ে, মনোবল জুগিয়ে– নানাভাবে রক্ষা করেছেন এই নারী সমাজ। নেপথ্যে থেকে নারী সমাজ কাজ করে গেছেন বলেই হয়ত তাদের নামগুলো অজানাই রয়ে গেছে। নারী সম্ভ্রমের প্রতীক। নীতিশাস্ত্রে নারীর মর্যাদা সবার ওপরে। নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী জাগলেই দেশ জাগে। বিশেষ করে সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে সহায়ক হিসেবে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম সবসময় একসঙ্গে হাত ধরে চলেছে। এদেশের মানুষকে আন্দোলন-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে সংগীত। সে সংগীতে পুরুষের পাশাপাশি নারী ছিল চিরকাল, আছে এবং থাকবে। আমাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন কিংবা সমাজজীবনেও নারীর ভূমিকা কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তাই তো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের সময়োচিত এবং সাহসী উচ্চারণ– 'কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি, সাহস দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।' সৃষ্টির পর থেকে আজকের সমাজ, সংস্কৃতি তথা বিশ্বসভ্যতার প্রতিটি স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। এই নারীরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় জনসংখ্যা অনুপাতে নারী ছিল অর্ধেক। এ হিসেবেই বলা যায়, রাডারের ভূমিকা পালন করেছে নারীরা। রাডার যেমন ভেতর ও বাইরের খবর দেয় নারীরাও ঠিক সেই ভূমিকাই পালন করেছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে শুধু পুরুষের জন্য নয় বরং নারীরাও এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। নারীর মুক্তিযুদ্ধের বিশালতাকে পরিমাপ করা যাবে না; এই বিশালতায় যেসব নারী বিভিন্ন অবস্থানে থেকে মুক্তিযুদ্ধকে সফল করেছেন তাদের অনেকের নাম এখনও অজানা। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সার্থক ফসল বিশ্বের মানচিত্রে আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশ, যার নাম বাংলাদেশ।

কামরুন-নাহার-মুকুল : নাট্যকার ও ফিচার লেখক

রাষ্ট্রপতি রচিত *এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ* গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন রচিত *এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ* গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ *Bangladesh will Go a Long Way* প্রকাশিত হয়েছে। আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক ওসমান গনি এবং বইটির সম্পাদনা-সমন্বয়ক ড. এম আবদুল আলীম ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে বইটি হস্তান্তর করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান এবং অনুবাদক দুলাল আল মনসুর উপস্থিত ছিলেন। বইটি অনুবাদ করেন দুলাল আল মনসুর।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাঁর রচিত গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ *Bangladesh will Go a Long Way* প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করে বলেন, বইটির মাধ্যমে পাঠকসমাজ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, পদ্মা সেতুর কাল্পনিক দুর্নীতি, সমসাময়িক রাজনীতি, আর্থসামাজিক বাস্তবতা ও দিন বদলের পালাসহ বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, পাঠকপ্রিয়তা পেলে তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে এবং ভবিষ্যতে লেখালেখির জন্য আরও আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা পাবেন।

প্রতিবেদন: আফরিন আক্তার

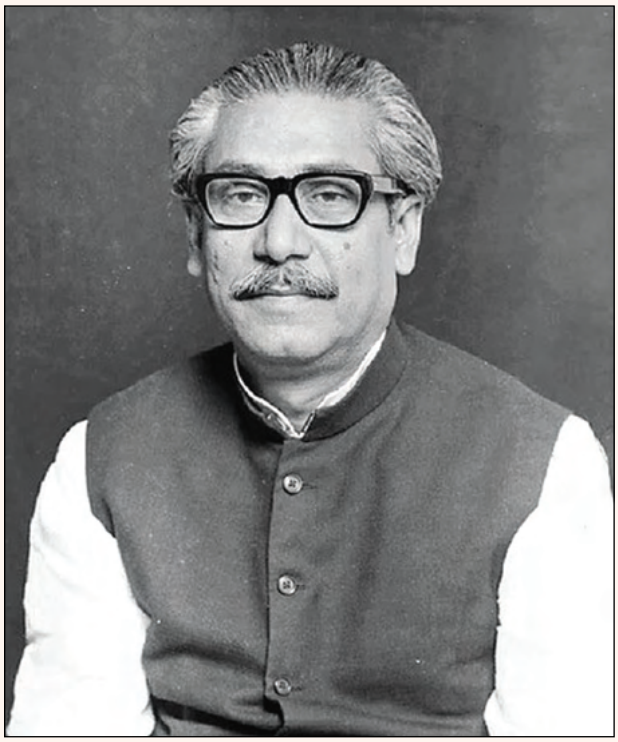

বিশ্ব জনমত

যদি রক্তই একটি জাতির স্বাধীনতার মূল্য হয় তবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে তা দিয়েছে। বাংলাদেশে আজ যা চলছে তা হচ্ছে নির্বিচার গণহত্যা, যার নজির আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। –স্টেটসম্যান

পাকিস্তানের জঙ্গী শাহীর অত্যাচার ও নরহত্যা হিটলারের বর্বরতাকে ম্লান করে দিয়েছে। –সানডে টাইমস

পাকিস্তানী বাহিনী যত শক্তিশালী ও যত আধুনিক মারণাস্ত্রেই সজ্জিত হোক না কেন, তাদের পরাজয় অবধারিত। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দখল করে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। –বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য মি. ব্রুস ডগলাসম্যান

পাক সেনা বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়েছে, তাদের হাতে নারী এবং শিশু রেহাই পায়নি। –নিউজল্যান্ড পার্লামেন্ট সদস্য

মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রই পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর শক্তির উৎস। মার্কিন সরকার যেভাবে অন্ধের মত পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারকে সমর্থন করে চলছে, তার ফলে পাক-ভারত উপমহাদেশে মার্কিন স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। –নিউইয়র্ক টাইমস

বাংলাদেশের সংগ্রাম ক্রমশঃ সুসংহত হচ্ছে। বাঙালীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে, তারপর আর এ কথা বিশ্বাস করা যায় না যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কোন প্রকার সংশ্রব রাখতে চাইবে। –ল্য মঁদে

জনগণের ভোটের রায়কে অস্বীকার করার ফলেই পাকিস্তানে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সেনা বাহিনী শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্যই বাংলাদেশকে চরমপন্থা বেছে নিতে হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ চায়নি। যুদ্ধ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। –গার্ডিয়ান

বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের রপ্তানী বাণিজ্য এখন বন্ধ। যুদ্ধের খাতে ব্যয়ের জন্য পাকিস্তান এখন দেউলিয়া হবার পথে । –দ্য দিগরো

রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী এখনও লড়াই চালাচ্ছে বটে! কিন্তু তারা জানে এ যুদ্ধে পরাজয় তাদের সুনিশ্চিত। –লেক্স প্রেস

পাকিস্তান সরকার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি বিশেষ চক্রের দ্বারা। এই চক্রটিতে আছে বৃহৎ ভূ-স্বামীর দল, আছে বিরাট টাকাওয়ালা ব্যবসায়ী, আছে সেনা বাহিনীর সেনাপতিরা। সারা পাকিস্তানের ৮০% ভাগ সম্পদের মালিক হল পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবার। –লস এঙ্গেলস

বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা মানব ইতিহাসের এক নির্মম অধ্যায়। লক্ষ লক্ষ বাঙালী যখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে পাকিস্তান তখন বাংলাদেশে অবস্থা স্বাভাবিক বলে চিৎকার করছে। মার্কিন সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। এই সঙ্কটের ফলে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হওয়া অসম্ভব নয়। ভারত উপমহাদেশে বর্তমানে যা ঘটছে তা খুবই উদ্বেগজনক। –এডওয়ার্ড কেনেডী

বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানে পাকিস্তান রাজী না হলে পাকিস্তানকে বৃটেনের কোন অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া চলবে না। –বৃটিশ শ্রমিক দলীয় সদস্য মিষ্টার বার্ণস

আলজিরিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের উপর যে কায়দায় বোমা বর্ষণ করা হত ঠিক সেই রকম ধারার বোমা ফেলা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর। –ল্য মঁদে

বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক প্রমাণ করানোর জন্য ইয়াহিয়া যে ৬ জন নূতন সাংবাদিককে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ভিরাতেল তার এক প্রবন্ধে বলেছেন, যে সব অফিসার সাংবাদিকদের নিয়ে ঘোরাফেরা করেছেন তারা সব সময় সেনা বাহিনীর নির্দেশিত ও সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে বলা হয়েছে যে, রক্তপাত ও সম্পত্তি নাশের অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে দাঙ্গার ফলে। সেনা বাহিনীর লোকেরা বোঝাতে চাচ্ছিলেন সব দোষ বাঙালীদের। ভিরাতেল আরো লিখেছেন: সমস্ত ব্যাপারটি হিন্দু চক্রান্ত ও ভারতের কারসাজি বলে প্রচারণা করবার চেষ্টা চলছে। –সাংবাদিক ভিরাতেল

ইয়াহিয়া খান বৃটিশ পার্লামেন্টারী দলের সদস্য মিসেস জিল নাইট-এর কাছে স্বীকার করেছে যে, বাংলাদেশে পাক বাহিনীর কার্যকলাপ খুব রুঢ় ও কর্কশ হয়েছে। –ডেলী টেলিগ্রাফ

বাংলাদেশের ঘটনাবলী সমস্ত উপমহাদেশেরই নয়– সমস্ত বিশ্বের শান্তিকে বিপন্ন করতে পারে। স্বস্তি পরিষদের উচিত এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা। –ডেলী মিরর

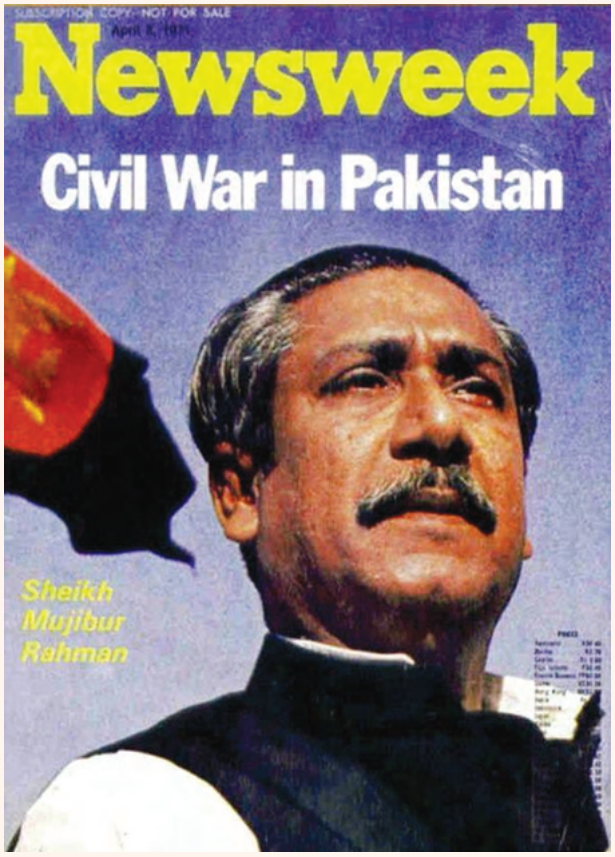

বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে তার জন্য দায়ী পাক সরকার। তারা ভোটের রায়কে বাতিল করবার জন্যই বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ করেছে। পাক সরকারই বাংলাদেশে অনধিকার প্রবেশকারী। –গার্ডিয়ান

বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীরা ভারতে এক করুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে আত্মীয়স্বজনকে পাক হানাদাররা গুলী করেছে। –নিউজ উইক

আমেরিকার পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া উচিত। কারণ সেই সরকার তার দেশের একটি বৃহদংশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তাকে সাহায্য দান করার অর্থ যুদ্ধের খরচা যোগান। –নিউইয়র্ক টাইমস

বাংলাদেশে যা ঘটছে তার জন্য ইয়াহিয়াই দায়ী। কোন দেশের অভ্যন্তরে এতো লোককে হত্যা করা হলে বিশ্ববাসী নীরব থাকতে পারে না। এখন সময় এসেছে এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীর নিন্দা করবার। –আমেরিকান উইকলি

বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞের সাথে ইতিহাসের অন্য কোন ধ্বংসলীলার তুলনা হতে পারে না। শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তাদের আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়ে সঙ্গিনের মাথায় গেঁথে ফেলে সৈনিকরা পৈশাচিক তৃপ্তি লাভ করছে। নারীদের বার বার ধর্ষণ করে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এ রকম ভয়াবহ অত্যাচারের কোন নজীর আধুনিক যুগের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। সেনাবাহিনী এই সীমাহীন অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের রক্তপিপাসু বিকৃত মনে। বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য অথবা তাদের বলা হয়েছে জনগণের মধ্যে ধ্বংসলীলা চালিয়ে এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের রাজত্ব ইচ্ছা করে সৃষ্টি করতে। বাংলাদেশে যে পাশবিকতা চালান হয়েছে পূর্বাঞ্চলের মানুষ আর কোন দিন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একত্রিত হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারবে না। পাকিস্তানের দু'অংশ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অসহায় শিশুরা যে ঘৃণ্য বর্বরতা দেখল জীবনে তাদের পক্ষে তা আর ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না। –নিউজ উইক

বাংলাদেশ সমস্যা এখন আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক উদ্যোগে রাজনৈতিক উপায়েই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। –বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবর্ণনীয় দুর্দশা ও নির্যাতনের সংবাদে হাঙ্গেরী সরকার উদ্বিগ্ন রয়েছে। –প্রধানমন্ত্রী জেনো

[বাংলার বাণী পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে গণহত্যা' শীর্ষক বিশেষ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

আইটিবি, বার্লিনে 'বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন' উদ্বোধন করলেন পর্যটন মন্ত্রী

৫ই মার্চ জার্মানির আইটিবি বার্লিনে বিশ্বের বৃহত্তম পর্যটন মেলায় 'বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন' উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান, এমপি। এ সময় জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মো. সাইফুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

প্যাভিলিয়ন উদ্বোধনের সময় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রচারের মাধ্যমে আমাদের পর্যটন পণ্যগুলো বিশ্বের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলাগুলো আমাদের পর্যটন পণ্য ও সেবা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য একটি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।

তিনি আরও বলেন, আইটিবি বার্লিনে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ক্রমবর্ধমান পর্যটন সুবিধাকে তুলে ধরে বিশ্ব পর্যটন বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পথ প্রশস্ত করবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নেতৃত্বে এ মেলায় বাংলাদেশ হতে রিভারাইন ট্যুরস, ট্রাভেল কাইটস, অতার্কি ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস, হিলভিউ ট্যুরিজম, এ ওয়ান ট্যুরিজম, এসকেপ বাংলাদেশ এবং গ্রান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট অংশগ্রহণ করছে। অংশগ্রহণকারীগণ মেলায় আগত বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের নিকট বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণের ওপর প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন অফার ও প্যাকেজ তুলে ধরছে।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

বাংলাদেশের ছড়ায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

ড. আশরাফ পিন্টু

ছড়া লোকসাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। ছড়ার উদ্ভব কখন কীভাবে হয়েছিল তার সুনির্দিষ্টতা না থাকলেও বলা যায় লোকছড়ার উদ্ভব হয়েছিল মানুষের মুখে মুখে। কেননা তখনও লিখিত সাহিত্য সুষমামণ্ডিত হয়নি, ভাষাও ছিল আধফোটা; জ্ঞান গরিমাও ছিল নিতান্তই হালকা ও অগভীর; তবে রস প্রাচুর্যের কোনো অভাব ছিল না। তাই ধারণা করা হয় এমনি এক পরিবেশেই বাংলা লোকছড়ার জন্ম হয়েছিল সেই প্রাক-মধ্যযুগে। এই মৌখিক সাহিত্যের ধারা চলতে থাকে দীর্ঘকাল। মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়াতে থাকে এই ছড়া দিয়ে। বাড়তে থাকে ছড়ার জনপ্রিয়তা। লোক-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ঘুম পাড়ানি ছড়ার ভেতর দিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসে সমাজ ইতিহাসের নানান কথা– 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কীসে?' এরপর ধীরে ধীরে ছড়া বিবর্তিত হতে থাকে। ছড়ার মধ্যে ধরা পড়ে সমাজের উত্থানপতনের নানা চিত্র। ফুলের মতো ছড়া হয়ে ওঠে লাঙলের ফলার মতো তীক্ষ্ণ ধারালো। ছড়া হয়ে ওঠে আধুনিক সমাজমনস্ক।

মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে প্রথম লিখিত ছড়া কোনটি সে সম্পর্কে কেউ সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। এদেশে পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার পরপরই কবি জসীমউদ্‌দীন 'দগ্ধগ্রাম' শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন। ধারণা করা হয় এটিই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কবিতা। 'দগ্ধগ্রাম' মূলত একটি পদ্য। যার শরীরে ছড়ার রূপ-রস-ছন্দ আছে। এটিকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ছড়া হিসেবেও মর্যাদা দিতে পারি। ছড়াটির আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

কীসে কী হইল, পশ্চিম হতে নরঘাতকেরা আসি
সারাগাঁও ভরি আগুন জ্বালায়ে হাসিল অট্টহাসি।
মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান
পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান।

খানসেনারা এমন জুলুম আর অত্যাচার চালাতে থাকে দীর্ঘ নয় মাস। আমাদের দামাল ছেলেরাও তাদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে, লড়াই করে, প্রতিশোধ নেয়। এর মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ করতে গিয়ে বাড়ি ফেরে না–

সোনামানিক ভাইরা আমার
সেই কবে কোন সনে
দানোর সাথে করতে লড়াই
গিয়েছিলেন রণে।
রণের শেষে মায়ের কোলে
আর ফেরেন নি তারা
সেই দুখে মার দু চোখ গেলো
অশ্রু বাঁধন হারা।
(সোনামানিক ভাইরা আমার : আখতার হুসেন)

ভাইরা প্রাণ দিলো, মায়ের বুক খালি হলো, অনেক মা-বোন সম্ভ্রম হারালো– তবেই না এদেশ মুক্ত স্বাধীন হলো। কিন্তু এ প্রজন্মের অনেকেই সেই ইতিহাস জানে না–

কেমন করে মুক্ত হলো সোনার বাংলাদেশ
একাত্তরের সেই কাহিনী আর হবে না শেষ।
সাগর পারের দত্যি এসে চাপলো যখন ঘাড়ে
দেশের মানুষ হঠাৎ করে বুঝলো হাড়ে হাড়ে।...
কেউ দেখেনি কেউ ভাবেনি তেমন ভীষণ লড়াই
তাই তো এদেশ মুক্ত করে করছি জয়ের বড়াই।
(শেষ হবে না : সুকুমার বড়ুয়া)

এখন আমরা জয়ের বড়াই করছি ঠিকই কিন্তু এ জয়ের জন্যে আমাদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে; দীর্ঘদিন আন্দোলন আর সংগ্রাম করতে হয়েছে– সর্বোপরি এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পেয়েছি একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ– একটি লাল-সবুজের পতাকা। যে দেশটিকে আমরা সকলে মিলেমিশে সুন্দর করে গড়ে তুলবো। ছড়াকার আবু সালেহের 'এই পতাকা ধরার কথা' ছড়াটিতে যেন এমন কথাই ধ্বনিত হয়েছে–

আমার কথা ছড়ার কথা
সোনালি এদেশ গড়ার কথা
হাসি খুশি উত্তল হাওয়ায়
মন ও হৃদয় ভরার কথা
অনন্তকাল স্বাধীনতার–
এই পতাকা ধরার কথা।

কিন্তু মানুষ যা চায় তা পায় না। সকলে মিলেমিশে সুখে শান্তিতে থাকতে চাইলেও তা হয়ে ওঠে না। কেননা এদেশে এক কালে যেমন 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' ছিল; ছিল মীর জাফর আর উমিচাঁদেরা– তারা এখনও আছে। যদিও আমরা–

দেশের জন্যে ঢেলেছিলাম বুকের তাজা রক্ত
আজ সেখানে হেঁটে বেড়ায় মীর জাফরের ভক্ত।
তবুও-ঘষেটি বেগম, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠের আত্মা
লাটসাহেব নাতি সাজে দেয় না দশের পাত্তা।
(স্বাধীনতার ছড়া: আসাদ বিন হাফিজ)

এসব ষড়যন্ত্র আর অবহেলা কারণেই দেশের অনেক মুক্তিযোদ্ধারা অপাঙ্‌ক্তেয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। একজন অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধার চিত্র ফুটে উঠেছে আমীরুল ইসলামের 'কাকার জন্যে পদ্য' শীর্ষক ছড়াটিতে–

কাকা
এই কি বেঁচে থাকা?
তুমি নাকি একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা ছিলে?
যুদ্ধ করতে জলে-স্থলে নদীতে খাল-বিলে।
শত্রু সেনার সাথে

আঁধার ঘেরা রাতে
টগবগিয়ে এল.এম.জি. জ্বলতো তোমার হাতে...
কিন্তু তুমি কি পেয়েছ কাকা?
এই কি বেঁচে থাকা?

এর চেয়ে আরও করুণ পরিণতি দেখা যায় আশরাফ পিন্টুর 'মুক্তিযোদ্ধা চয়েন' শীর্ষক ছড়াটিতে–

চয়েন উদ্দিন চয়েন
থালা হাতে দ্বারে দ্বারে
করে সে বয়েন।
কখনো ধমক খায়
কখনো বা গালি
বেঁচে আছে এভাবেই
দিয়ে জোড়াতালি
চয়েন উদ্দিন চয়েন
মুক্তিযুদ্ধে সে নাকি
করেছিল জয়েন!

মুক্তিযোদ্ধার এমন ক্রমপরিণতি দেখা যায় ছড়াকার ফারুক নওয়াজের 'এই লোকটাই' ছড়ায়–

হাতি নেই তার ছাতি নেই তার গরু নেই তার গাধাও নেই
হাত নেই তার দাঁত নেই তার দিদি নেই তার দাদাও নেই
কিছু নেই তার তবু লোকটার কাছে এক গোছা দাড়ি আছে
শুনেছে লোকটা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে লড়িয়াছে।...
কিছু নেই তার শুধু বুকে তার কালযক্ষ্মার কাশি আছে
এই লোকটার নেই কিছু আর মৃত্যু ঘনায়ে আসিয়াছে।

এমন নির্মম পরিণতির পর ছড়াকার পরিশেষে এই বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন–

... তবে হৈলো কথাটা এই
এই লোকটাই বেঁচে থাকবেই দেশ স্বাধীনের ইতিহাসেই।

শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় নয়, এখনও এদেশের সাধারণ মানুষ নিপীড়িত-নিগৃহীত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী যে চেতনা তা যেন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ধনী-গরিবের ব্যবধানটা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় লুৎফর রহমান সরকারের 'মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক ছড়াটিতে–

দেশ আজ স্বাধীন হলো
মানুষ তবু বন্দি
ধুঁকে ধুঁকে আজো মরে
এ কেমন ফন্দি।
কিছু লোক বড়লোক
গাড়ি বাড়ি হাঁকছে
ছোট-বড় ব্যবধান
দিন দিন বাড়ছে।

কিন্তু এ থেকে নিষ্কৃতির উপায় কী? তবে কী এ সমাজ পরিবর্তনের জন্যে আরও একটি যুদ্ধ করতে হবে– যে যুদ্ধ হবে শ্রেণি ব্যবধান ঘোচানোর যুদ্ধ। যদিও যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, এ ধ্বংসলীলা কেউ চায় না; তবুও–

ধ্বংস দিয়েই ধ্বংসটাকে রুখতে হয়
গন্ধটাকে শুঁকতে হয়
সাহস করে ঝুঁকতে হয়।
লুত নগরীর ভাঙাগড়া আসতে দাও
কিসতি নুহের ভাসতে দাও
সুরুজটাকে হাসতে দাও।
যুদ্ধ দিয়েই যুদ্ধটাকে রুখতে হয়
এমনি করে সুবাস ফুলের শুঁকতে হয়।
(যুদ্ধ : সাজ্জাদ হোসাইন খান)

বাংলাদেশের ছড়া আমাদের ঐতিহ্যগত গর্বের সম্পদ। অতীতকাল থেকেই ছড়ায় উঠে এসেছে সমকালীন দেশ ও সমাজের বাস্তবচিত্র। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক ছড়াকারগণও দেশ ও সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন তাদের ছড়ায়। আমাদের বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের ছড়াকারগণ এদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং তার পরবর্তী প্রেক্ষাপট সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন তাদের ছড়ায়।

ড. আশরাফ পিন্টু: বিভাগীয় প্রধান (বাংলা), মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা, ashrafpintu.sonon@gmail.com

বিপিএম-পিপিএম পদক পেলেন ৪০০ পুলিশ সদস্য

বিপিএম সাহসিকতা ও সেবা এবং পিপিএম সাহসিকতা ও সেবা- এ চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিবছর পুরস্কার দেওয়া হয়। যারা এ পদকে ভূষিত হন তাদের নামের শেষে বিপিএম ও পিপিএম উপাধি যুক্ত হয়। 'স্মার্ট পুলিশ স্মার্ট দেশ, শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪' উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজারবাগ পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ সপ্তাহের প্রথম দিন সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সর্বাধিক সংখ্যক ৪০০ পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) ও রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী।

এবার অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ৩৫ জন পুলিশ সদস্যকে 'বাংলাদেশ পুলিশ পদক' (বিপিএম), ৬০ জনকে 'রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক' (পিপিএম) এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ৯৫ জন পুলিশ সদস্যকে 'বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবা' এবং ২১০ জনকে 'রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবা' পদকে ভূষিত করা হয়।

এবারের পদকপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ থেকে পদক পেয়েছেন ৭৩ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য। ডিএমপির আটটি অপরাধ বিভাগের (ক্রাইম ডিভিশন) মধ্যে মতিঝিল বিভাগ থেকে সবচেয়ে বেশি ৮ জন পদক পেয়েছেন।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

শহিদ আবু সুফিয়ান: একটি রক্তাক্ত ইতিহাস

মিয়াজান কবীর

প্রাচীন একটি জনপদের নাম দিনাজপুর। দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার পচাহার গ্রামের ছেলে আবু সুফিয়ান। বাবা মোহাম্মদ আলি আর মা আজিরন নেসার ঘর আলোকিত করে ১৯৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এই ছেলেটি। দুই ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। মা-বাবার তিন মেয়ে সন্তানের পর জন্ম হয় আবু সুফিয়ানের। তাই সবার চোখের মণি ছিলেন সুফিয়ান।

আবু সুফিয়ানকে লেখাপড়ার জন্য ভর্তি করে দেওয়া হয় বাড়ির পাশে প্রাইমারি স্কুলে। ছোটোবেলা থেকেই লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন তিনি। আলোকদিহি জানবক্স হাই স্কুল থেকে পাস করেন এসএসসি। বাবার আর্থিক অভাব-অনটনের জন্য কলেজে আর ভর্তি হবার সুযোগ পাননি। তাই তিনি চাকরির সন্ধান করতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে আবু সুফিয়ান ফায়ারম্যান পদে যোগদান করেন ফায়ার সার্ভিসে।

কালের পরিক্রমায় একাত্তরে আবু সুফিয়ান পঁচিশ বসন্তের এক যুবক। শরীরে বহে টগবগে শোনিতধারা। দুচোখ ভরা তার রঙিন স্বপ্ন। এই মধুর রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেন। গহিন মনের স্বপ্নকে রূপ দিতে খালাতো বোন হাসিনার সঙ্গে বিয়ে পাকাপাকি হয়। বদল হয় হাতের আংটি। পানচিনির আনুষ্ঠানিকতা রূপ নেয় আনন্দ উৎসবে। এমন সময় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দেশে চলছে তখন হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবলীলা। সারা দেশ পরিণত হয় মৃত্যু বিভীষিকায়। এসব কারণে বিয়ের দিনক্ষণ পিছিয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালে আবু সুফিয়ানের কর্মস্থল ছিল সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশনে। সৈয়দপুর শহর ছিল বিহারি অধ্যুষিত এলাকা। এছাড়া মার্চ মাসে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনে সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সংহতি প্রকাশ করে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার সঙ্গে। ২৩শে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। এই পাকিস্তান দিবসে সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশনে লিডার আলি হোসেন মৃধার নেতৃত্বে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্টেশনের ভেতরে সবুজ জমিনে লাল সূর্য খচিত পতাকা উড়তে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিহারিরা। বিহারিদের চক্ষুশূল হয়ে পড়ে ফায়ার ফাইটাররা। জীবনের ঝুঁকি এড়াতে লিডার আলি হোসেন মৃধাসহ অনেকে আত্মগোপন করেন। আবার অনেকে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকেন।

১৫ই এপ্রিল বিহারিরা সৈয়দপুর এলাকায় হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। বাঙালিদের ঘরে ঘরে তল্লাশি করে চালাতে থাকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ফায়ারকর্মীরা সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশনে বন্দি অবস্থায় অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে থাকেন। তবে সহকর্মী বিহারিদের মধ্যে অনেকেই বাঙালিদের যাতে ক্ষতি না হয় সে দিকেও সচেষ্ট ছিলেন।

ফায়ার ফাইটার আবু সুফিয়ান ও গাড়িচালক হাবিবুর রহমান ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ। তারা দুজন স্টেশন থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পরিস্থিতি এতই প্রতিকূল ছিল যে স্টেশন থেকে বের হবার কোনো সুযোগ ছিল না। সেই জন্য স্টেশন থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া আর সম্ভব হয়নি।

ডিসেম্বরে দেশের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা সেই সাথে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। অপরদিকে পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিরোধ নামে বাঙালি নিধনে পৈশাচিকতায় চালায় হত্যাযজ্ঞ। এর মধ্যে ফায়ারকর্মীরা দেশের জান-মাল রক্ষার্থে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো কাজে নিয়োজিত। ৪ঠা ডিসেম্বর। সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশনের কাছাকাছি ওয়াপদার পাওয়ার হাউজে তেলের ট্যাঙ্কিতে বোমার বিস্ফোরণে ঘটে। ফলে তেলের ট্যাঙ্কিতে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। টেলিফোনে আগুনের সংবাদ পেয়ে মরিচ অস্ট্রিজ গাড়ি নিয়ে ফায়ার ফাইটাররা আগুন নেভাতে যায়। পাকিস্তানি বাহিনী পুকুরপাড়ে বাঙ্কার করে অবস্থান করছে। আর আকাশ পথে ভারতীয় বিমান বাহিনী বোমা নিক্ষেপ করে চলেছে। এ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ফায়ারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে। তারপর লেডারের সাহায্যে উপরে উঠে অগ্নিনির্বাপণ কাজে আত্মনিয়োগ করে। এমন সময় ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশপথে চালায় আক্রমণ। আক্রমণের ফলে অগ্নিনির্বাপণ অস্ট্রিজ গাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফায়ার ফাইটাররা জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কায় লেডারের মাধ্যমে দ্রুতবেগে নীচে নেমে আসে এবং নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকে। পরক্ষণেই আরেকটি বোমার শেলের আঘাতে ফায়ার ফাইটার আবু সুফিয়ান ডান পায়ে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তখন সহকর্মী আবু সুফিয়ানকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যান গাড়িচালক হাবিবুর রহমান।

আবু সুফিয়ানকে কাঁধে তুলতে গিয়ে হাবিবুর রহমান দেখতে পেলেন, তার ডান পা'টি শরীর থেকে ঝুলে পড়েছে। তখন তিনি প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে দুটি পা একসঙ্গে বেঁধে ঘাড়ে তুলে নিয়ে আসেন নিরাপদ জায়গায়। তারপর ওয়াপদার একটি গাড়িতে নিয়ে গিয়ে আবু সুফিয়ানকে ভর্তি করা হয় সৈয়দপুর হাসপাতালে। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের দরুন রাত আটটায় হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আবু সুফিয়ান। পঁচিশ বসন্তের ফুল ঝরে গেল বোমার আঘাতে। বাগদত্তা বধূ হাসিনার গাঁথা হলো না আর বিনি সুতার মালা।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক, miajankabir@gmail.com

জেলা পর্যায়ে কর্মসংস্থান দরকার

মোতাহার হোসেন

রাজধানী ঢাকা বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল নগরীর অন্যতম। মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অধিকাংশ অফিস, আদালত, কর্মসংস্থানসহ মানুষের অপরিহার্য প্রায় সব সেবা ও সুযোগের ব্যবস্থা ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত রাজধানীমুখী হচ্ছে। তাছাড়া অনুরূপ সেবা ও সুযোগের আশায় মানুষ ঠাঁই নিচ্ছে শহর ছেড়ে নিকটস্থ বিভাগীয় ও জেলা শহরেও। একইসঙ্গে নগরায়ণের ফলে দেশের অন্যান্য নগরগুলোতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা। নগরায়ণও হচ্ছে দ্রুতগতিতে। সেই সঙ্গে নগরীতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিবিধ সমস্যা। গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট, যানবাহন সংকট, জলাবদ্ধতা, দূষণ ও যানজটের পাশাপাশি নতুন নতুন অসংখ্য সংকট নগরবাসীর ঘাড়ে চেপে বসছে। ফলে নগরগুলো দিন দিন আরও বাসযোগ্যহীন হয়ে পড়ছে। নগরীর এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা নিরসনে ঢাকাকে বৃত্তাকার সড়ক, নৌ, রেল যোগাযোগের আওতায় আনা, রাজধানীর নিকটস্থ জেলা, উপজেলায় পরিকল্পিত উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, অফিস-আদালত স্থানান্তর ও নতুন করে গড়ে তোলা, দেশের জেলা শহরগুলোকে হাব হিসেবে ধরে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়েই তৈরি করা হচ্ছে কর্মসংস্থান। জেলার সঙ্গে গ্রামকে যুক্ত করে সুষম উন্নয়ন জরুরি। টেকসই ও বাসযোগ্য নগরায়ণে এসবের বিকল্প নেই।

নগরীকে বাসযোগ্য করার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা প্রায়শই নানান উদ্যোগ আয়োজন করে থাকে। ঠিক এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি 'স্থায়িত্বশীল নগরায়ণ: সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতেও প্রায় অভিন্ন এমন অভিমত উঠে এসেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সিপিডির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, অতি নগরায়ণের ফলে যানজট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নগরায়ণের ঝুঁকি বাড়ছে। আবাসন কোম্পানিগুলোর চটকদার বিজ্ঞাপনের ফলে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সেখানেও নাগরিক সুবিধার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সেখানে মেয়রের হাতে পুলিশ থেকে শুরু করে শহরের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলামের অভিমত, শহরে দিন দিন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। দেশে নগরায়ণ বাড়ছে। ১৯৭৪ সালে দেশে নগরায়ণের হার ছিল মাত্র ৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ। ১৯৮১ সালে হয় ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ২০ দশমিক ১৫ শতাংশ, ২০০১ সালে ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ, ২০১২ সালে ৩১ শতাংশ এবং ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৯ দশমিক ৭১ শতাংশে। নগরায়ণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিভাগ সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে একগুচ্ছ সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

'নগরায়ণ ও দুর্যোগ: ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের অভিঘাত' প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, যত বেশি নগরায়ণ হবে তত বেশি বিপদ ডেকে আনা হবে। বড়ো ধরনের ভূমিকম্প হলে তার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সক্ষমতা আমাদের নেই। ভূমিকম্পের দিক থেকে দেশের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ঝুঁকিতে থাকলেও আশার কথা হলো, নিকট ভবিষ্যতে বড়ো ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ লেলিন চৌধুরী তার প্রবন্ধে বলেন, আগামীতে মানুষের সুস্থতা নির্ভর করবে অভিন্ন স্বাস্থ্য ধারণা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। অভিন্ন স্বাস্থ্যের একটি প্রায়োগিক ধারণা প্রস্তুত করা দরকার।

একজন পরিবেশবিদ বলেন, বাসযোগ্য নগরীতে ১২ শতাংশ উন্মুক্ত স্থান ও ১৫ শতাংশ এলাকায় সবুজের আচ্ছাদন থাকার কথা কিন্তু আছে সামান্য। ঢাকা শহরের সঙ্গে যুক্ত আটটি নদী ঘিরে সার্কুলার নৌপথ চালু করতে না পারাটা আমাদের ব্যর্থতা। যানজটের ভারেও ন্যুব্জ হয়ে আছে ঢাকা। গণপরিবহণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শামসুল হকের অভিমত, যানজট নিরসন করতে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ করার কাজও প্রথম ধাপে রয়েছে। এটাকে সামনের দিকে নিতে না পারলে কার্যকর গণপরিবহণ ব্যবস্থা কোনোভাবেই গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। জনঘনত্ব ও শহরের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার

জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এলাকাভিত্তিক জনঘনত্বের ম্যাপ তৈরি করা। এলাকাভিত্তিক সামাজিক ও নাগরিক সুবিধা ও অবকাঠামোর তালিকা প্রস্তুত করা। সেই অনুযায়ী উন্নয়ন অনুমোদন দেওয়া। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় বরং সামগ্রিক টেকসই শহরের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রাজধানীকে বাসযোগ্য করতে নগরীর পাশাপাশি শহরতলী এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গ্রামীণ এলাকায় পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। শব্দ ও বায়ু দূষণ রোধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দূষণমুক্ত করা। এ ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পয়ঃনিষ্কাশনে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নগরীর নীচু এলাকার জলাবদ্ধতা ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিকল্পিত সমাধান করা। ইটভাটা নির্মাণকাজ ও শিল্পকারখানার বায়ু দূষণের প্রধান উৎস চিহ্নিত করে দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসা। বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পরিবেশ দূষণ, পানি দূষণ রোধে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পরিবেশ ঝুঁকির বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা। নগরীতে খোলা জায়গা ও খেলার মাঠ নির্মাণে সরকারের বিনিয়োগ, ভাসমান ও বস্তিবাসীদের রাজধানীর বাইরে শহরতলী ও পার্শ্ববর্তী জেলায় কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, যোগাযোগ, অফিস-আদালত গড়ে তোলা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, যানজট নিরসনে ফুটপাত নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ, বাস রুটের যৌক্তিকীকরণ এবং শহরে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত জায়গা, পর্যাপ্ত জলাশয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি। এসব করা গেলে ঢাকাকে বাসযোগ্য করার পথ সুগম হবে। সর্বোপরি জরুরি প্রয়োজন জেলায় জেলায় কর্মসংস্থান।

মোতাহার হোসেন: সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

বঙ্গবন্ধু অ্যাপ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বঙ্গবন্ধু অ্যাপ' উদ্বোধন করেন। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী এবং বাংলাদেশের সৃষ্টির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে দরবার টেকনোলজিস লিমিটেডের তৈরি অ্যাপটি উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

অ্যাপটি উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, একই সঙ্গে আমাদের মহান স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ডিজিটাল প্ল্যাটফরম তৈরি হয়েছে। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অ্যাপটি তৈরির মহতী উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদন: ফায়ান হাসান

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস

শারমিন ইসলাম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৫ই মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালন করা হয়। বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসের ইতিহাস বেশ ঘটনাবহুল। ১৯৬২ সালের ১৫ই মার্চ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কংগ্রেসে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ভোক্তাদের চারটি অধিকার বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। এগুলো হলো: নিরাপত্তার অধিকার, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, পছন্দের অধিকার এবং অভিযোগ প্রদানের অধিকার। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ কেনেডি বর্ণিত চারটি মৌলিক অধিকারকে আরও বিস্তৃত করে অতিরিক্ত আরও ৮টি মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করে। কেনেডির ভাষণের দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৫ই মার্চকে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস হিসেবে বৈশ্বিকভাবে পালন করা হয়।

১১ই জানুয়ারি ২০২৪ এক সেমিনারে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অতিরিক্ত সচিব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান বলেন, ১৫ই মার্চ বৈশ্বিকভাবে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের ১১৫টি দেশের ২২০টি আন্তর্জাতিক ভোক্তা অধিকার সংগঠনের সঙ্গে সংহতি রেখে বাংলাদেশেও ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। এবার কনজ্যুমার্স ইন্টারন্যাশনাল (সিআই) দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– 'ফেয়ার অ্যান্ড রেসপন্সিবল এআই ফর কনজ্যুমার্স'।

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, এবার দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেমিনার, রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া একই দিনে দেশের সাতটি বিভাগে, ৫৬টি জেলায় ও ৪৩৫টি উপজেলায় সেমিনারের আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে সিসিএমএস (বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ), সাপ্লাই চেইন মনিটরিং সিস্টেম (এসসিএমএস) ও ভোক্তা অধিকারবিষয়ক আইপি টিভির উদ্বোধন করা হবে। এছাড়া দিবসটিকে কেন্দ্র করে প্রেস ব্রিফিং আয়োজন, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, স্মরণিকা প্রকাশ ও ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করে প্রচার করা হবে।

ভোক্তা অধিদপ্তরের ডিজি আরও জানান, বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ডিজিটাল ঘড়ির মাধ্যমে কাউন্টডাউন কর্মসূচি, থিম সংগীত প্রস্তুত, ভোক্তাদের ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন, টিভি টকশোসহ দিবস সংক্রান্ত ইভেন্ট আয়োজন ও অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতে টকশো, প্রোগ্রাম, গোল টেবিল বৈঠকসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

বাজার ব্যবস্থার সাথে আমরা আমৃত্যু জড়িত। একটি শিশু জন্মের পর তার প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা থেকে শুরু করে একজন মানুষের মৃত্যুর পর তার দাফনকার্য সম্পন্ন করার জন্য কিছু পণ্য কিনতে হয়। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা সবাই ক্রেতা। আমরা ক্রেতা হিসেবে যেসব বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য বা সেবা কিনি, সেসব বিক্রেতাও কোনো না কোনোভাবে ক্রেতা। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে ভোক্তা কে বা কারা। জাতীয় ভোক্তা অধিকার আইন অনুযায়ী, যিনি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে বা সম্পূর্ণ বাকিতে পণ্য বা সেবা কেনেন অথবা আংশিক মূল্য পরিশোধ করে বা আংশিক বাকিতে পণ্য বা সেবা কেনেন অথবা কিস্তিতে পণ্য বা সেবা কেনেন অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পণ্য কেনাবেচা করেন তিনি ভোক্তা। ভোক্তা অধিকার একটি মৌলিক অধিকার, যা কি না সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে ৪৭ (ক)-এ নিশ্চিত করা আছে। সরকার ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার আইন পাস করে। যেখানে খাদ্য, চিকিৎসা, পণ্য, ওষুধ ও সেবা খাতের ভোক্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সরকারের একটি প্রাধিকার কর্মসূচি। এ আইনের অধীন ২০০৯ সালে Quasi Judiciary বা আধা বিচারিক সংস্থা হিসেবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা আইনানুসারে সার্বক্ষণিক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকেন। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে জেলা ও অধীনস্থ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এই কাজগুলো করেন। দায়িত্বরত কর্মকর্তারা কিছু মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে অপরাধীদের বিচারকার্য পরিচালনা করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করে থাকেন। ভোক্তা অধিকারবিরোধী কার্য বা অপরাধগুলো হলো– নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বা সেবা বেচাকেনার প্রস্তাব করা; জেনেশুনে ভেজাল পণ্য কেনাবেচার প্রস্তাব করা; স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্য কোনো খাদ্যপণ্যের সাথে মেশানো ও বিক্রি করা; মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাকে প্রতারিত করা; প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় ও সরবরাহ না কর; ওজনে, বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা; পরিমাপে, দৈর্ঘ্য পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা; কোনো নকল পণ্য বা ওষুধ উৎপাদন করা; মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করা; নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো কাজ করা,

যাতে সেবাগ্রহীতার নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে; অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাত করা; অবহেলা, দায়িত্বহীনভাবে সেবাগ্রহীতার অর্থ বা স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি ঘটানো; পণ্যের মোড়ক ব্যবহার না করা বা পণ্যের মোড়কের গায়ে খুচরা বিক্রয়মূল্য, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি লেখা না থাকা; আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে পণ্যের মূল্যতালিকা ঝুলিয়ে প্রদর্শন না করা; আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে সেবার মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা প্রভৃতি ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ। অধিকার সম্পর্কে জেনে বা না জেনে আমরা প্রায় সবাই উল্লিখিতভাবে প্রতারিত হয়েছি এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছি। যারা নিজেরা ভোক্তা, কিন্তু ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জানেন না, তারা নিজেদের সচেতনতার অভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। কিন্তু যারা অধিকার সম্পর্কে জেনেও প্রতারিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন, তার অন্যতম কারণ হলো– প্রতারকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া।

ভোক্তা অধিকার অবশ্যই মানবাধিকার। কারণ, ভোক্তা অধিকারের সঙ্গে মানুষের জীবন-জীবিকা ও বেঁচে থাকার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভোক্তারা বরাবরই পণ্য ও সেবা উভয় ক্ষেত্রেই অন্যায্যতার শিকার। করোনার বিধিনিষেধের সময় যখন মানুষ ঘরবন্দি, তখন অনলাইন কেনাকাটা বেশ জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর ফাঁকে একটি বিশেষ সময়ে ধামাকা অফারের নামে বিপুল অঙ্কের মূল্যছাড়ের অফারে ই-কমার্সভিত্তিক বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে আগাম অর্থ পরিশোধ করে পণ্য ডেলিভারি না পেয়ে এখন আহাজারি করছেন লাখ লাখ গ্রাহক ও উদ্যোক্তা। আবার ক্যাম্পেইন-ভেদে পণ্য সরবরাহ করার কথা ৭ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে। কিন্তু সেই শর্ত কখনোই মানে না প্রতিষ্ঠানগুলো। কখনো ৬০, কখনো ৯০ দিনে পণ্য দেওয়া হয়। আবার কখনো পণ্য দেওয়া হয় না, টাকাও ফেরত দেওয়া হয় না। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলি প্রায়ই অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও কূটকৌশলী বাক্যে ভরপুর থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ইংরেজি ভাষা, যা সাধারণের বোধগম্য নয়। কখনোবা অক্ষরগুচ্ছ এমনভাবে সাজানো থাকে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া সেসবের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

প্রতারকেরা যেসব অপকর্ম করে থাকেন তা হলো, দামি পণ্যের অর্ডার নিয়ে কম দামি পণ্য সরবরাহ করা, ত্রুটিপূর্ণ-নিম্নমানের পণ্য দেওয়া, গ্রাহকের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত আচরণ না করা, মিথ্যা, বাহারি ও নামিদামি তারকা, মডেল ও খেলোয়াড়দের ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রভৃতি। আবার পণ্যের মজুত না থাকলেও অর্ডার নেওয়ার মতো প্রতারণা করে যাচ্ছে এক শ্রেণির প্রতিষ্ঠান। আর অধিকাংশ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর ক্যাশ ডেলিভারি পয়েন্ট ভোক্তাবান্ধব নয়। সেখানে গেলে ক্রেতাকে অনেক ক্ষেত্রে নাজেহাল হতে হয়। কখনো কখনো অর্ডার করা পণ্যের আংশিক সরবরাহ করে বাকি পণ্য দেওয়া হয় না। স্পেশাল ইভেন্ট যেমন ঈদ, পূজার সময় লোভনীয় অফার দিয়ে ক্রেতার কাছ থেকে টাকা নিলেও সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করা হয় না। আর প্রতারণার শেষ ধাপটি হলো, রিফান্ড ওয়ালেটে ফেরত দেওয়া ও পণ্য কিনতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিয়েছে নানামুখী উদ্যোগ। কেনাকাটা, ব্যাবসাবাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন এখন অনেক কিছুই ডিজিটাল বা অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রতিদিন এ খাতে ভোক্তাদের ঝুঁকির নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। মুঠোফোনে আর্থিক সেবাগুলোর (এমএফএস) গলাকাটা ক্যাশ আউট চার্জ আদায়ের কারণে সাধারণ মানুষের জন্য ডিজিটাল আর্থিক সেবা আশীর্বাদ না হয়ে গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমএফএসগুলোর গুরুতর অভিযোগগুলোর অন্যতম হলো ক্যাশ আউট চার্জ অনেক বেশি। আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা ক্যাশ আউট চার্জ কমিয়ে এক অঙ্কে নামিয়ে আনতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারীদের পরামর্শ দিয়েছেন। মুঠোফোনে ক্যাশ আউটের উচ্চ রেটের কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মধ্যবিত্ত, নতুন উদ্যোক্তা ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। বর্তমানে বিকাশ, রকেট, নগদ, ইউক্যাশ, এমক্যাশ, শিওর ক্যাশসহ দেশে ১৬টি প্রতিষ্ঠান এমএফএস কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর্থিক লেনদেন ও কেনাকাটায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের অত্যধিক সুদের হারে সাধারণ গ্রাহকেরা প্রবঞ্চনার শিকার হন। কনজ্যুমার্স ইন্টারন্যাশনালের মতে ২০২৪ সাল নাগাদ ডিজিটাল ব্যাংকিং গ্রাহক ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে (জুনিপার রিসার্চ ২০২০)।

বাংলাদেশে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে সরকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করে। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এ সংস্থা। এছাড়া সারা বিশ্বের ভোক্তা সংগঠনগুলোর ফেডারেশন কনজ্যুমার্স ইন্টারন্যাশনাল (সিআই) ভোক্তা অধিকার প্রচারণার একমাত্র সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। বিশ্বের ২৫০টি দেশ সংগঠনটির সদস্য। বাংলাদেশের একমাত্র ও শীর্ষস্থানীয় ভোক্তা সংগঠন কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) কনজ্যুমার্স ইন্টারন্যাশনালের পূর্ণাঙ্গ সদস্য। ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভোক্তা সংগঠনগুলো নানামুখী কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতারিত হলে ভোক্তাদের কী করণীয়– কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারিত সংক্ষুব্ধ ভোক্তা, ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৭৬ (১) অধীন এ অধিদপ্তরে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সত্যতা প্রমাণিত হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আদায় করা জরিমানার ২৫ শতাংশ অভিযোগকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়। এই আইনের অধীনে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। তাহলে বোঝা গেল, প্রতারিত ভোক্তা খরচের ভয়ে মামলা করবে না; এমন কোনো কারণ নেই। কেননা, ভোক্তা অধিকার আইন এমন একটি নিয়ম রেখেছে, যেখানে মামলা করলে খরচ নয় বরং আয় হয়। এখন আমরা যারা ভোক্তা, প্রতিনিয়ত নানা কৌশলে প্রতারিত হচ্ছি, শুধু ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জেনে একটু সচেতন হলেই আমরা এর মোকাবিলা করতে পারি। ফলে বিক্রেতারাও প্রতারণা করার সুযোগ পাবে না। প্রত্যেক মানুষের সচেতনতাই পারে উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

বীমা শিল্প ও বাংলাদেশ

সুভাষ চন্দ্র

বীমা হলো দুই পক্ষের মধ্যে একটি আইনসম্মত চুক্তি। একপক্ষ বীমাকারী, অন্যপক্ষ বীমাগ্রহীতা। বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিবে বলে নিশ্চয়তা দিয়ে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং বীমাগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তবে জীবন বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হয় না, কারণ মানুষের জীবনের কোনো মূল্য পরিমাণ করা যায় না। তাই জীবন বীমার ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এজন্য বলা হয়, বীমা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পণ্য– যা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমা শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বীমা জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় (প্রিমিয়াম) সংগ্রহ করে মূলধন গঠনে সাহায্য করে। মানুষের জীবন, ঋণ ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবস। স্বাধীনতার মহান রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পূর্বে বীমা খাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগ দেন। এ কোম্পানির অফিসেই তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর এ যোগদানের দিনটিকে জাতীয় পর্যায়ে স্মরণীয় রাখতে ২০২০ সালের ১৫ই জানুয়ারি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে প্রতিবছর ১লা মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। প্রথম দিকে জাতীয় বীমা দিবস 'খ' শ্রেণিতে পালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১১ই অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় বীমা দিবসকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। মূলত বীমা শিল্পের উন্নয়ন ও বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই বীমা দিবস পালিত হয়।

১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবসটি বিভিন্ন র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বর্ণাঢ্য প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এ দিবসে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়ে থাকেন। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হয়। এ বছর জাতীয় বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য– 'করবো বীমা গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন একটি জাতির উন্নতির প্রথম শর্ত তার অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা। তাই বাঙালি জাতিকে পরাধীনতামুক্ত করে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের জীবন-সম্পদের সুরক্ষা এবং শিল্পায়নে বীমার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই স্বাধীনতার পরপরই তিনি বীমা খাতকে ঢেলে সাজাতে এ খাতকে জাতীয়করণ করেন। বীমা ব্যাবসাকে সুশৃঙ্খল কাঠামোবদ্ধ অবয়ব প্রদানের লক্ষ্যে কয়েক ধাপে বীমা খাত পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ৮০টি বেসরকারি বীমা কোম্পানির পাশাপাশি এ দুটি বীমা কর্পোরেশন বীমা সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৭৩ সালে জাতির পিতার নির্দেশনায় বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি।

বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বীমা আইন ১৯৩৮-কে রহিত করে বীমা আইন ২০১০ এবং একই সাথে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে– যা ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি ৩০টি বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের বীমা শিল্পকে উন্নত বিশ্বের বীমা শিল্পের কাতারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার একটি সময়ভিত্তিক বীমা নীতিমালা ২০১৪ জারি করে। ২০১৪ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত নয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় নতুন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নতুন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখান থেকে উত্তরণের জন্য নতুন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে নতুন জাতীয় বীমা নীতি ২০২৪ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ব্যাবসাবান্ধব বীমা খাত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো– কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইন্স ২০২৩ জারি, কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংকাস্যুরেন্স) নির্দেশিকা ২০২৩ প্রবর্তন, বীমা গ্রাহক সুরক্ষা গাইডলাইন্স জারি, বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশনা জারি, সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন, মরটালিটি ও মরবিডিটি টেবিল তৈরি, বীমা মেলা আয়োজন, জাতীয় বীমা দিবস আয়োজন, তথ্য সমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল তৈরি, বীমা দাবি বিরোধ/অভিযোগ নিষ্পত্তি, বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম, নতুন বীমা পরিকল্প অনুমোদন, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন ইত্যাদি। এছাড়া বীমা পণ্য তৈরি, বিতরণ, বীমা দাবি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য তরুণ উদ্যোক্তা এবং Insur Tech / Startups প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ 'রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স গাইডলাইন্স ২০২৩' জারি করেছে। ২০২০ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ 'ইউনিফাইড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম' নামে একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম চালু করেছে, যার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে বীমাগ্রহীতাদের মোবাইলে প্রিমিয়াম জমার তাগিদ জানিয়ে খুদে বার্তা এবং পরবর্তীতে প্রিমিয়াম জমা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আরও একটি খুদে বার্তা

প্রেরণ করা হতো। বর্তমানে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে পলিসি রিপোজেটরি, ই-রিসিপ্ট, e-KYC, বীমা তথ্য মোবাইল অ্যাপ ও পোর্টাল, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুলস ও অনলাইন এজেন্ট লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবাসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী উন্নত-স্মার্ট দেশে পরিণত হওয়া। উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিরসনে বীমা বিশ্বব্যাপী অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বীমার ব্যাপ্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথা জনমনে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বীমা খাতের উন্নয়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে ৮০৩.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হবে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মুজিববর্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' চালু করা হয়। ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৫০ হাজার অভিভাবককে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমার আওতায় আনা হয়। কর্তৃপক্ষ বেসরকারি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই পলিসি চালুর নির্দেশনা প্রদান করায় ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭৮,৫০১ জন শিক্ষার্থী এই বীমার আওতায় এসেছে। এছাড়াও খেলোয়াড়দের জন্য 'বঙ্গবন্ধু স্পোর্টসম্যান কম্প্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স', দুর্ঘটনার ঝুঁকি আবরণের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা', প্রবাসী কর্মীদের জন্য 'প্রবাসী বীমা' সুবিধা চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' পরিকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ থেকে 'কম্প্রিহেনসিভ মোটরযান বীমা' নতুন আঙ্গিকে প্রচলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্সটেন্ডেট ওয়ারেন্টি বীমা, ত্রুটিযুক্ত দায় বীমা, স্বাস্থ্য সেবা / Digital OPD, শস্য বীমা, ভবন বীমাসহ অন্যান্য বিষয়েও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। অন্যদিকে নারীর ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে নারীদের জন্য পৃথক পৃথক বিবিধ বীমা পরিকল্প চালু করে বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন: নিবেদিতা বীমা, দেনমোহর বীমা, প্রমিলা ডিপিএস বীমা, নিবেদিতা প্লাস বীমা এবং পারিবারিক নিরাপত্তা বীমা।

বর্তমানে সরকারি বৃহৎ প্রকল্পসমূহের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ অন্য মেগা প্রকল্পগুলোর বীমা ঝুঁকি দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে আবরিত হচ্ছে।

প্রিমিয়াম জমার বিপরীতে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালে দেশে মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১১.৯০ কোটি টাকা। ২০০৮ সালে বীমা খাতের মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৫,৩১৭.০৮ কোটি টাকা, যা ২০২৩ সালে ১৭,৪৮৪.০৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০২৩ সালে প্রিমিয়াম আয়ে ২২৮.৮২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ বছরভিত্তিক গড় প্রবৃদ্ধি ১৪.৩০ শতাংশ।

বীমার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের বীমা সুরক্ষার কথা বিবেচনা করেন। কর্তৃপক্ষ বীমাগ্রাহকদের জন্য হটলাইন নম্বর ১৬১৩০ চালু করেছে, যাতে বীমাগ্রহীতারা তাদের বীমা দায় সংক্রান্ত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অধিকাংশ বীমাকারী অনুরূপ হটলাইন নম্বর চালু করেছে।

বাংলাদেশের বীমা খাত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখনো কাঙ্ক্ষিত বিকাশলাভ করতে পারেনি। বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সুশাসন পেশাদারিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বীমা খাতে অ্যাকচিউয়ারি এবং দক্ষ জনবল সংকট একটি বড়ো সমস্যা, যা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্রুত নিরসন করা প্রয়োজন। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো সংশোধনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাকচিউয়ারিয়াল সাইন্স ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হয়েছে। এ বৃত্তির আওতায় ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ২ জন বৃত্তিধারী যুক্তরাজ্যের সিটি ইউনিভার্সিটির বায়েস বিজনেস স্কুলে অধ্যয়ন করছেন এবং ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ১ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স ইন অ্যাকচিউয়ারিয়াল সায়েন্স, মাস্টার্স ইন অ্যাকচিউয়ারিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং প্রফেশনাল অ্যাকচিউয়ারির জন্য আংশিক বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সামান্য অংশই বীমার আওতায় রয়েছে। আমাদের অগ্রসরমান অর্থনীতিতে এ হার জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশের দোরগোড়ায় বীমা সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বীমা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের আর্থিক সক্ষমতা তৈরি করছে। এছাড়া বীমার অনলাইন বিপণনের মাধ্যমে বীমার প্রসারের সুযোগ রয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে 'ব্যাংকাস্যুরেন্স সেবা' পদ্ধতি চালু করার জন্য কাজ করছিল। এ বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪-এ 'ব্যাংকাস্যুরেন্স সেবা' পদ্ধতি উদ্বোধন করেন। এ সেবা সরাসরি ব্যাংক থেকে বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় থাকা জনগোষ্ঠীর কাছে বীমা পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর করবে। পাশাপাশি লাইফ ও নন-লাইফ বীমা ব্যাবসার জন্য বীমা পরিকল্পের বৈচিত্র্যকরণ বীমাকে বেশি সংখ্যক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট পৌঁছে দেবে। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বীমার আওতায় রয়েছে। এ বীমা সুবিধা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় বিশেষ করে ব্যক্তি গ্রাহকদের দারিদ্র্য সীমার উর্ধ্বে থাকতে সহায়তা করবে। আগামীতে বাংলাদেশে বীমা শিল্পের পথচলা সমৃদ্ধ হোক; যাতে করে আমরা অচিরেই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে পারি।

সুভাষ চন্দ্র: প্রাবন্ধিক

নূর হোসেনের পদধ্বনি

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

জামিলার কোনো কিছুতেই তর সয় না– এ তার আজকের স্বভাব নয়, বরাবরের অভ্যেস।

সেই কত বছর আগে লাল শাড়ির পুঁটুলি হয়ে করমালীর ঘরে সে এসেছে। স্বামীর নুন আনতে পান্তা ফুরানো সংসারের জোয়ালটাকে টেনেহিঁচড়ে চালিয়েছে সে এতদিন, চার ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। কোলে এসেছে পারুলী, বকুলী, জামাইল্যা, কামাইল্যা।

কিন্তু জামিলার স্বভাবের কোনো হেরফের হয়নি। সব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা ওর চিরকালের অভ্যেস।

আজ করমালী ঢাকা যাবে দুমেয়েকে আনতে। পারুলী আর বকুলীকে, পারুলী তো আছে ওর সোয়ামির ঘরে, দু'বছর আগে যে বিয়ে হয়েছে সেলিমের সঙ্গে তারপর মেয়ে আর এমুখো হয়নি। এখন মেয়ের শরীর খারাপ। আর কদিন পরই মা হবে সে। জামাই তো মহাচণ্ডাল। এসব খবরাখবর কিছু জানায়নি সে।

গাঁয়ের বুড়ো ইমদু সেই বস্তিতে গিয়ে দেখে এসেছে পারুলীকে। গাঁয়ে ফিরে এসে বলেছে, তোর জামাই বড়ো রগচটারে করমালী।

সেই শোনা অবধি জামিলার চোখের পানি আর শুকোয় না।

ওর মুখে এক কথা,

যাও না, ঢাকা গিয়া মাইয়ারে লইয়া আও।

শুরু হয়েছে মহা ফ্যাসাদ।

করমালী রেগেমেগে বলে,

– হুন, মাইয়া কি অখন আমার আছে? সেলিইম্যা যদি হেরে আইতে না দ্যায় তো আনুম ক্যামনে?

– য্যামনে পারেন আনবেন। ক্যান, আমার লগে গোসসা করেন, চিল্লাপাল্লা করেন, তো জামাইর লগে পারবেন না? পারুলীর লগে কইয়া দিলাম আমার হুরু মাইয়ারে আনবেন।

– মাইয়া মানুষ আর কারে কয়।

করমালী মনে মনে হাসে। দামান্দকে কি কিছু বলতে জানে না সে? বল্লে তো পারুলীর সাথেই খিটিমিটি করবে সে।

ছোটো মেয়ে বকুলী আছে মিয়াবাড়ির মেয়ে বেদানার কাছে।

ঢাকা যদি সে পারুলীকে আনতে যায় তো বকুলীকেও সে সঙ্গে নিয়ে আসবে। জামিলা মা বলে দু'মেয়ের জন্য যখন-তখন আহাজারি করে, বাপ হয়েছে বলে বুঝি করমালীর ওদের জন্য মায়া নেই?

এবার ঢাকা গিয়ে আগে বকুলীকে সঙ্গে নিয়ে পারুলীর কাছে যাবে। তারপর দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠবে। গাড়ি ঝিকঝিক করে ছুটবে। বকুলতলী গাঁ কাছে যত আসবে– দু'বোনের চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠবে, মেঠোপথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে জামিলা আর দুটি ছেলে জামাইল্যা, কামাইল্যা।

দিনের বেলাও এই সুখস্বপ্নে করমালীর কোটরে ঢোকা দুটি চোখ সজল হয়ে ওঠে।

ছোটো একটি লালচে কাগজে মিয়াবাড়ির ছোটো মেয়ে বেদানার ঠিকানা নিয়ে ঘুরতে থাকে। রিক্সা, গাড়ি, ট্রাকের ঝমঝম, ক্রিং ক্রিং আওয়াজে দিশেহারা হয়ে যায় সে।

তামাম ঢাকাজুড়েই বুঝি খালি সেন্ট্রাল রোডের পথ? তো বেদানার বাসা কোথায়?

খুঁজতে খুঁজতে বিকেল ঢলে যায়। পেটের খিদেয় অসার হয়ে যায় হাত-পা। রাস্তার পাশে ইট পেতে বসা হোটেলে মোটা চালের লালচে ভাত আর মাছের সুরুয়া দিয়ে খেয়ে যেন স্বস্তি পায় কিছুটা। এবার আবার নতুন করে বাড়ি খোঁজা। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে।

– ও ভাই সাহেব, ও বাবা সকল এট্টু হুনেন, এই রাস্তায় দুই কুড়ি তিন নম্বরের বাড়িটা মেহেরবানী কইরা দেহাইয়া দিবেন?

কেউ কথা বলে না। সবাই ব্যস্ত, ছুটছে সবাই। কেউ ছুটতে ছুটতে বলে– এইদিকে যাও, কেউ বলে ঐদিকে যাও।

পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে করতে পেটের ভাত কখন হজম হয়ে যায়। কী যে এক গোলকধাঁধায় পড়ল সে।

এই শহরে কি কেউ সত্যি কথা বলে না? এই যে করমালী বিপাকে পড়ে ঘোরাঘুরি করছে তাতে কারো কিছু এসে যায় না।

– বাপ সকল আমি ফকির না, আমারে খালি আপনেরা মিয়াবাড়ির ছুড়ু মাইয়ার বাড়ীডা দেহাইয়া দ্যান।

দুই বছর আগেও এই শহরে এসেছে করমালী। তখন এত বিপাকে পড়েনি সে। বেদানার বাড়ির

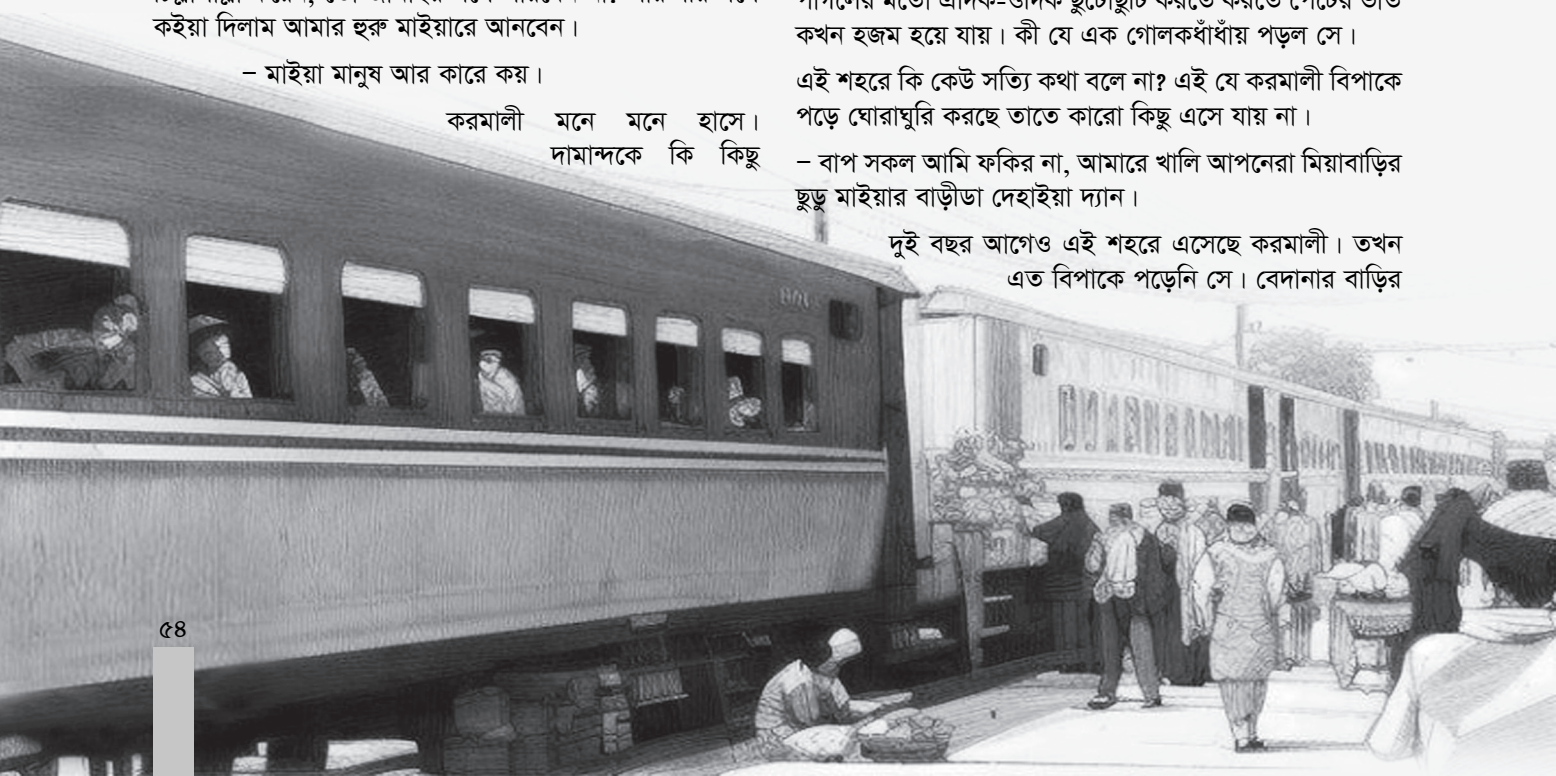

সামনে মনোহারী একটা দোকান ছিল। সে দোকান থেকে কতো বিড়ি কিনে খেয়েছে সে। মানুষজনের মুখ বেশ চেনা হয়ে গেছিল।

এবারে সব কিছু নতুন নতুন লাগে। সব কিছু অন্যরকম, চারদিকে ভূঁইফোঁড়ের মতো অগুনতি দোকান-পাট গজিয়ে উঠেছে। করমালী এর ভিতর থেকে মিয়াবাড়ির বেদানার বাড়ি চিনবে কী করে?

আগে কি এই জাগায় ফুলের দোকান আছিল? শরবতের দোকান আছিল?

ফলের রস আর ফুলের সুগন্ধে নেশা ধরে যায় করমালীর। ঢিলেঢালা প্যান্ট আর লাল-নীল গাঢ় রঙের জংলা শার্ট পরা কটি জোয়ান ছেলে সামনে দাঁড়াতেই বুকে ভরসা পায় করমালী।

– বাপ সকল, এই ঠিকানাটা হলদে-কাগজটা বের করে সে। তীক্ষ্ণ চোখে কাগজটি দেখে একজন বলে,

– সেই বাড়ির আপনার দরকারটা কি চাচা মিয়া?

করমালী হাসি-হাসি মুখে বলে,

– আমার ছুড়ু মাইয়া বকুলী হেই বাড়িতে কাম করে।

– মাইয়াডার বয়স কেমন? মাইয়াডা যুবতী না কিশোরী? মাইয়াডা কালা না ধলা?

শুনতে শুনতে করমালী অনুভব করে, ওর সারা শরীরের রক্ত উনুনে বসানো ভাতের হাঁড়ির মতো টগবগ করে ফুটছে। এই এক দঙ্গল বদমায়েশ পোলাপানের রসিকতার খোরাক হতে গিয়ে দড়ির মতো শিরায় ভরা পাকানো হাতটি শক্ত হয়ে ওঠে।

একটি ছেলে বলে, এই চাচা মিয়ারে বাড়িটা দেখাইয়া দে। আপনি সামনের দিকে যান– ডানে যে গলি পাবেন সেদিকে গিয়ে ঠিক উল্টো দিকে বড়ো দালানটি দেখবেন, তার পাশ দিয়ে যে রাস্তা আছে সেদিকে যেতে যেতে একটা পুকুর দেখবেন, পুকুরটির ঠিক ডানদিকে–

অসহায়ের মতো করমালী বলে,

– বাপ সকল কী যে আউলা-ঝাউলা কইরা কইল, বেবাক তো বুঝবার পারলাম না–

বুঝবার পারলেন না, আসন্ন সন্ধ্যা কাঁপিয়ে ওরা গমগম করে হাসে। অচেনা শহরে দাঁড়িয়ে আসন্ন ধূপছায়া সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে করমালীর বুক ভেঙে কান্না আসে ।

– এই চাচারে ভালা কইরা বুঝায়া দে রে হাবলু। চাচা তো বুঝবার পারে নাই। জোয়ান ছেলেদের হৈ-হল্লা আর হাসির মাঝে হঠাৎ যেন বাঁশির মতো মন-কেমন করা সুর সে শোনে।

– বাপজান, ও বাপজান। করমালী তাকিয়ে দেখে, ঝকঝকে পালিশ করা চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে ডাকছে বকুলী। অথৈ সাগরে থই খুঁজে পায় সে। এক ছুটে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। ঐতো তাদের বকুলতলী গাঁয়ের মিয়া বাড়ির ছোটো মেয়ে বেদানা বিবির বাড়ি।

ছবির মতো বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখতেই করমালী শুনে তীক্ষ্ণ কথা।

– তুমি এ সময় কি মনে করে করমালী? করমালী চোখ তোলে তাকিয়ে দেখে বেদানা বেগমকে।

গায়ের সরল সহজ-মানুষ বলে অনেক কিছুই বোঝে না করমালী কিন্তু আদর-সোহাগ-মমতা ভালো বোঝে। কেউ আদর করে দু'এক কথা বললে সে মোমের মতো গলে গলে যায়।

বেদানা যে করমালীকে দেখে খুশি হয়নি তা সে ভালোই বুঝতে পেরেছে। বুনো মোষের মতো করমালী রাগে ফুঁসতে থাকে।

– মাইয়া ঢাকা নিয়া আসপার সোময় তো কত্তো কাকুতি-মিনতি করছিলা। আর এহন?

বকুলী বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বলে,

– ক্যামুন আছ বাপজান?

– ভালো না রে বকুলী ভালা না, এ কথাটুকু বলতে চায় সে।

কিন্তু তার আগেই বেদানা তীক্ষ্ণ গলায় বলে,

– তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করিস? যা কিচেনে যা। ড্রইংরুমে গেস্টরা বসে আছেন, চা-নাশতা দে।

বেদানার আদেশে স্প্রিং-এর মতো, বাপের কাছ থেকে সরে যায় বকুলী। চাকা লাগানো ট্রলিতে করে কত যে নাশতা গেল ড্রয়িংরুমে, করমালী শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

করমালী বারান্দার এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। মেহমানদের আনাগোনা, নাশতার খুশবু, সবার সদাব্যস্ত চলাফেরা দেখতে দেখতে মনে হয় করমালী নতুন এক জগতে এসেছে। অচেনা এই জগত। বকুলতলার চেনা সংসারের সাথে একেবারেই মিল নেই।

কাজকর্ম শেষ করে ক্লান্ত মুখে বকুলী একসময় কাছে আসে। বলে,

– বাপজান বাবুর্চি খানায় আস, খাবা না?

এককোণে রং চটা মলিন কলাই করা থালার মাঝে ভাত।

ছালুন দিয়ে ভাত মেখে লোকমা তুলতে গিয়ে থমকে যায় সে।

– আমি চোর? চোরের মতো খাইমু?

করমালীর চোখ দুটি করমচার মতো লাল। বকুলী অসহায়ের মতো বলে,

– চিল্লায়োনা বাপজান। গোসসা কইরো না। কত্তো বড়ো মানুষ এই বেদানা খালা। অনেক ট্যাহা-পইসা।

– আরে ফালাইয়া থো তো বড়ো মানুষ গো ট্যাহা-পইসা, কইলজা ওগো ছোডো, বুঝছ? রাগে-দুঃখে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে বকুলীর বিছানায়।

এ বাড়ির সঙ্গে এ ঘরটির কোনো মিল নেই, স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। ভেজা ভেজা গন্ধ, একা শুয়ে শুয়ে সে বকুলীর প্রতীক্ষা করে। কত যে কাজ ওর। শেষ হয় না কাজ।

থালাবাসন ধোয়ার আওয়াজ শুধু রাতের প্রহরকে নাড়া দিয়ে যায়।

করমালী ঘুমিয়ে পড়ে। এক সময় থিতিয়ে আসে কাজ। বকুলী কাছে এসে গায়ে আলতো হাত দিয়ে ডাকে,

– বাপজান, ও বাপজান, ওডো না। দুগগা ভাত খাও বাপজান। হেই সময় ভাত ফেলাইয়া উইঠা গেলা।

দলা দলা ঠান্ডা ভাত, ডাল আর পুঁইশাকের তরকারি। নিশ্বাস ফেলে করমালী, মাছ-গোশতের মন কাড়া ঘ্রাণে এ বাড়ির বাতাস ভারি হয়ে আছে। তবু বকুলী আর করমালীদের ভাগে এসবের ছিটেফোঁটাও জুটে না।

বকুলীর অভ্যেস আছে। কী অনায়াস ভঙ্গিতে আঙ্গুলে ভাত মেখেমেখে লোকমা গিলে। পরম তৃপ্তিতে বলে খাও খাও বাপজান, জলদি খাও। ঘুমাবা না?

করমালী কী করবে? মেয়ের মতো অনায়াস ভঙ্গিতে সে তো খেতে পারে না। অনাদরের ভাত বলেই ওর বুকে বেশি বেজেছে।

বাড়িতে তো এমনি কতদিন হয়।

হুদা ভাত, নুন-কাঁচালংকা মেখে ভাত খায় ওরা। গুঁড়া মাছ আর কুচো চিংড়ি দিয়ে ভাত মেখে খেতে কী আনন্দ! কিন্তু আজ যে অপমানের কাঁটা ফুটেছে বুকে। গাঁয়ের মানুষ এলে কি এমনি অবহেলা করে ভাত দেয়?

চোখ কেমন ভিজে ওঠে করমালীর।

রাতে শুয়ে শুয়ে সে ঠিক করল, বকুলীকে আর এ বাড়িতে রাখবে না। কদমতলী গায়েই নিয়ে যাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বেদানা আম্মাকে কোথাও দেখে না করমালী। চায়ের পাট শেষ হয় না বাড়িতে।

এক সময় মুখোমুখি হতেই সে বলে,

– বেগম আম্মা, বকুলীরে লইয়া যাই? ওর মা যে জবর কান্দে।

যেন নতুন কথা শুনেছে বেদানা। বলে, বলছ কি করমালী? হুটহাট নিয়ে যাবে বল্লেই হলো? সারা রাত বাপ-মেয়ে শুয়ে শুয়ে বুঝি ফন্দি এঁটেছ?

– ফন্দি করছি? ফন্দি করছি আমি? করমালী অসহায়-ক্রোধে ঘোলাটে চোখে বেদানার মীনে করা মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেদানার স্বামী কাটলেটের টুকরো কাঁটা চামচ দিয়ে মুখে দিতে দিতে বলে, ওসব মতলব ছাড়ো করমালী।

নিস্তেজ বাঘের ঘুমন্ত রাগে ফুঁসে ওঠে সে। নিজের মাইয়ারে বাইত নিমু, তাও কথা হুনায়? এ বাইত ভাত খায় কুন হালায়?

মলিন কাঁথা গায়ে, জামিলার দেয়া চালের পিঠার পুঁটুলিটা নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে করমালী।

– যাইও না বাপজান, যাইও না ।

পেছনে কিশোরী মেয়ের বুক ভাঙা কান্না শ্রাবণের বৃষ্টি হয়ে ঝরতেই থাকে। তবু সে পেছনে ফিরে তাকায় না।

ছুটতে থাকে সে বাসাবোর দিকে।

বস্তিটা সে সহজেই পেয়ে যায়। দালানকোঠা চেনার মতো ঘুরে ঘুরে মরতে হয় না।

সকাল তখন ফুরিয়ে গেছে, আশ্বিনের চড়চড়ে রোদে গোটা বস্তিটি উত্তাপ নিচ্ছে।

– পারুলী রে, ও মা পারুলী

– কেডা? বলতে বলতে ঝুপড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সেলিম্যা।

চোয়াড়ে দামান্দকে দেখে রক্ত চড়ে যায়। মানুষের স্বভাবের তো কতো বদল হয়। কিন্তু এই হারামির বাচ্চা সেলিম্যার আর স্বভাব বদল হলো না। সে ঠিক আগের মতোই আছে।

বাবরি চুল, গলায় বাঁধা রঙ্গিন রুমাল, চোখ ঢুলুঢুলু। কোটরে ঢোকা গাল।

ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে পারুলী।

সেলিম পারুলীর দিকে তাকিয়ে বলে,

– দেহস কী? কী দেহস? তোর বাপ। এই তর বাপেরে ক'ট্যাহা দিতে, আমি বিদেশ যামু।

সারা বস্তিজুড়ে দৈনন্দিন জীবনযাপনের কলকাকলী, পেঁয়াজ-রসুন বাগাড় দেওয়ার ঝাঁঝালো ঘ্রাণ, ডেকচিতে চাপানো পুঁইডাটা, চিংড়ি, কাঁচালংকা, ধনেপাতার মিশ্রিত গন্ধে শরতের রোদ ভারী হয়ে এসেছে।

পারুলী তীক্ষ্ণ গলায় বলে, তুমি বিদেশে যাইয়া ফূর্তি ওড়াবা আর ট্যাহা দিব বাপজান, ক্যান?

– কী কইলি?

করমালীর চোখের সামনে পারুলীর চুল টেনেহিঁচড়ে সেলিম্যা ভিতরে যায়।

উঁচুগ্রামের কথা শোনে করমালী।

ক তোর সোহাগের বাপরে ক'ট্যাহা দিতে।

করমালী শুনে তার বড়ো আদরের প্রথম মেয়ে পারুলীর কান্না।

ওর বড়ো কষ্ট, বড়ো অপমান। নিজের চোখের সামনে মেয়ের এই হেনস্থা দেখে করমালীর চোখের নিষ্প্রভ মণি স্থির হয়ে থাকে।

ঝুপড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আবার সে ছুটতে থাকে। পথ পাচ্ছে না তো করমালী। গাঁয়ের মেঠোপথ কোথায়? শীতল হাওয়া কোথায়?

তার পায়ের নীচে তপ্ত পিচঢালা পথ-রাস্তায় শুধু মানুষ। পথ খুঁজে পাচ্ছে না সে।

ঢাকায় নাকি এসব স্লোগান আর মিটিং নতুন কিছু নয়। সবাই হাত নেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'আমাদের দাবি মানতে হবে।'

খানিকক্ষণ সবার সঙ্গে অসহায়ের মতো পা চালিয়ে হাঁটে সে। পর মুহূর্তেই সে সবার সঙ্গে গলা মিলায়।

ওরও তো দাবি আছে, মিয়া বাড়ির ছোটো মেয়ে বেদানার রঙচঙা বাড়িতে যে তার বকুলীরে আটকাইয়া রাখছে। ওরে মুক্ত কইরা আনতে হইব না?

আর পারুলী? তার বড়ো আদরের পারুলীরে সেলিম্যা যে মাইরা ফালাইতাছে, ওরে বাঁচাইতে হইবো না?

করমালী শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সবার সঙ্গে গলা মিলায়। হঠাৎ এক অবাক করা কাণ্ড দেখে সে। বুকেপিঠে কত কী লেখা জোয়ান এক পোলা মিছিলে শরিক হয়েছে।

কী তার দীপ্তি কী ওর বলিষ্ঠ গলা! ক্যামেরা নিয়ে কী ছবি তোলার

হিড়িক! করমালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ছেলেটিকে। মুগ্ধ হয়ে যায় সে।

ঢাকায় এসে অনেক দুঃখ পেয়েছে সে। অনেক কষ্ট তার। পারুলী আর বকুলীর জন্য তার বুকভরা যন্ত্রণা। তবু ছেলেটিকে দেখে তার বুকের সব ব্যথার পাহাড় নিমেষে কোথায় হারিয়ে যায়। কোথা থেকে ছুটে আসে বুলেট। বুক-পিঠ ভর্তি লেখার ওপরে গুলি লাগে। নিমেষে ঝাঁঝরা হয়ে যায় বুক। রক্তের বন্যার মাঝে লেখাগুলো হারিয়ে যায় ।

চারিদিক থেকে ধ্বনিত হতে থাকে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক-নূর হোসেন জিন্দাবাদ।'

এলোমেলো ছুটে যাওয়া মানুষের সাথে দৌড়াতে থাকে বকুলতলী গাঁয়ের করমালী।

–জমিলা রে কই পাডাইলি আমারে? এইহানে মানুষ মানুষরে মাইরা ফালাইতাছে।

কমলাপুর স্টেশনের দিকে ছুটতে থাকে সে। হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনে ওঠে। ছুটন্ত ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দের সাথে এক সময় ঘুম নেমে আসে তার।

খুব ভোরে ট্রেন থামে স্টেশনে। এখন কিছু হাঁটাপথে গেলেই বকুলতলী গাঁ ।

করমালী এলোমেলো পায়ে হাঁটে। হাতে তার চালের পিঠার পুঁটুলি। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর।

তবু যেন বুকভরে নিশ্বাস নিতে পারে সে। এখানে খোলা আকাশ, ফুলের সুগন্ধি মাখা বাতাস, তিরতির করে বয়ে যাওয়া নদী করমালীর শরীরটা জুড়িয়ে দেয়।

জবা ফুলের মতো টুকটুকে লাল সূর্য আকাশ আলো করে হাসছে। সেই কোমল আলোয় লালচে চোখে দেখে, মেঠোপথের মুখে দাঁড়িয়ে আছে জামিলা, জামাইল্যা, কামাইল্যা।

সবার চোখ বাঁচিয়ে পিঠের পুঁটুলিটা ফেলে দেয় সে নদীতে।

মনে মনে বলে, জামিলা রে, পারুলী-বকুলীরে দুইডা ভালা-মন্দ কথা জিগাইয়া তোর গুঁড়ি পিডা দিবার পারি নাই। তুই কষ্ট পাইবি এর লাইগা নদীতে ফালাইয়া দিলাম।

বুবুরা আহে নাই? পারুলীবু, বকুলীবু? জামাইল্যা-কামাইল্যা ছুটে আসে।

ক্লান্ত গলায় করমালী বলে, কেউ আহে নাই।

সারাদিন জামিলা মিয়াবাড়িতে মুড়ি ভেজে কিছু মুড়ি পেয়েছে। চেয়ে-চিন্তে গুড় এনেছে। দু'মেয়ের জন্য মোয়া গড়ে টিনে রেখেছে।

বহুদিন জামিলার মনটা এমন ফুরফুরে হয়ে ওঠেনি। অভাবের সংসার, তবু মেয়ে দুটি দু'দিনের জন্য আসবে, ভারী আনন্দ ছিল তাই। জামিলা বলে,

– ওরা আহে নাই?

– না রে জামিলা; আমার বকুলী মায়ে খালি ডাইল দিয়ে ভাত খায়।

– আর পারুলী?

– হ্যার খবর হুনবা? সেলিম্যায় হেরে আর মাইরা রাহে না।

ঘরের মলিন বিছানায় করমালী কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে, পাশে জামিলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। জ্বরের ঘোরে জামিলার খসখসে হাতখানি করমালী হাতে নেয়।

– তয় জানস জামিলা, এইবার ঢাহার শহরে একটা আচানক জিনিস দেখলাম।

জামিলা স্বামীর মুখের দিকে কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে।

– দেখলাম, জোয়ান একটা পোলা, নূর হোসেন-এর নাম। জামিলা আগ্রহ ভরে শুনতে শুনতে বলে,

– ও বুঝি আমাগো মিয়াবাড়ির মাইঝা পোলা নূর হোসেন্যা?

করমালী কাঁথা গায়ে দিয়েই বিছানায় উঠে বসে, আরে ফালাইয়া থো তোর মিয়াবাড়ির মাইঝা পোলা।

– গোসসা করেন ক্যান?

হুন, হে এক আচানক পোলা, মিছিল চলতাছে হাজার হাজার মানুষ হেই মিছিলে! আতকা কই থাইকা ছুইটা পোলাটা আইল। ছিনায় আর পিডে খালি লেখা। কাগজের মাঝে কালি দিয়া যেমুন লিখে– হেই লাহান তার ছিনা আর বুকেরে বানাইছে কাগজ।

–হাচা? মুগ্ধ হয়ে কিস্‌সা শোনার মতো চোখ জামিলার।

– কোন মায়ের পোলা গো? কি লিখন লিখল ছিনায় আর পিডে?

– হে তো আমি ভালো কইরা কইবার পারি না। চোখ থাকতেও আন্ধা । মাইনষে কইল লিখা আছে- 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।'

– এইডা আবার ক্যামুন কথা? এই কথা তো কুনুদিনও হুনি নাই। দুইডা মাইয়ারে কইলেন লইয়া আনবেন। হেও আনলেন না, এহন খালি প্যাঁচাল পারতাছে।

প্যাচাল না রে, দামি কথা, জামিলা হুন, আমগো পারুলীর সন্তান হইব! কেমুন পোলা সন্তান হইবার পারে ক'দেহি। যার ভয়-ডর থাকপো না। এই যে বকুলী দুপ্রহর রাইতে হুদা বাত খায়, তর পারুলীরে সেলিম্যা মারতে মারতে শেষ কইরা ফালাইবার চায়– পারুলীর সাহসী পোলা হইলে তো রুইখা খাড়াইব।

গলা খাদে নামিয়ে বলে,

– তুইতো জানস আমার সাবাস নাই। কেউ কিছু কইলে রুইখা খাড়াইবার পারি না।

জ্বর-ঘোরে পড়ে থাকা করমালী চেঁচায়।

– ঐ হুন রে, পারুলীর যে পুলা হইব হের আওয়াজ হুনবার পাস? পাস? কান পাইতা থাক, হুনবি। এক হোসেন মরছে, আর এক হোসেন আইতাছে। হের পায়ের ঝন ঝন আওয়াজ হুনবার পাস?

সন্ধ্যারাতেই ঝিমঝিম করে নেমেছে বৃষ্টি। আশ্বিনের অসময়ের বৃষ্টি। শেষ শরতের স্নিগ্ধ আলো ছাপিয়ে, শোঁ শোঁ হাওয়ার আওয়াজকে চুর চুর করে সরিয়ে কে যেন আসছে। পৃথিবী কাঁপিয়ে আসছে।

করমালী আর জামিলা কান পেতে তার পায়ের আওয়াজ শুনতে থাকে।

---o---

ইদু পাগলও শহিদ হয়েছিল

রফিকুর রশীদ

এক

মানুষের কত রকম যে মুদ্রাদোষ থাকতে পারে, তার হিসাবনিকাশ মেলানো ভার। এ দোষ হাতেনাতে ধরিয়ে দিলেও কেউ মানতে চায় না। তখন তার উপরেই উল্টোপাল্টা চোটপাট– মাথা খারাপ! এ রকম হতেই পারে না। আমাদের মিতুরও হয়েছে সেই ব্যামো, কিছুতেই নিজের ভুল মানতে চায় না। কথায় কথায় আমাকে শুনিয়ে দেয়– 'পাগল নাকি!'

পাগল তো বটেই। আমি এক রকম মেনেই নিই, সবার ভেতরেই একটু-আধটু পাগলামি থাকে এবং তা থাকাই ভালো। টনটনে জ্ঞানগম্যি দিয়ে যে জীবন চলে সে জীবন বড়োই আঁটোসাঁটো। জীবনকে সহজ সাবলীল ঢিলেঢালা করে দেখতে হলে খুব নিভৃতে একটুখানি পাগলামির ছোঁয়া থাকতে হয়। আমি একটু জোর দিয়ে মিতুকে বলি,

– কেন তোমার বুঝি পাগলামি নেই!

মিতু তেতে ওঠে– মাথা খারাপ!

– মাথা খারাপের কী দেখলে!

– পাগল আর কী!

আমাকে পাগল প্রতিপন্ন করায় কী যে তার আনন্দ, সে-ই জানে। একবার-দুবার নয়, সারা দিনে আমাকে বহুবার শুনতে হয় পাগল সম্বোধন। ওই যে কথায় আছে একই মিথ্যে বারংবার শুনতে শুনতে এক সময় সত্যের চেহারায় দাঁড়িয়ে যায়। সেই দশা হয়েছে আমারও। একদিন কাঁধ বাড়িয়ে আমি কবুলও করি,

– হ্যাঁ, পাগল তো বটেই, নইলে তোমার পাগলামির ফাঁদে এভাবে ধরা পড়ি!

– 'ফাঁদে!' ঠোঁট ফোলায় মিতু, 'তোমাকে ফাঁদে ফেলেছি আমি!'

দুহাত তুলে আমি সারেন্ডার করি,

– ফাঁদ শব্দটি আমি এক্সপাঞ্জ করছি।

খুব সাবলীল ব্যাখ্যা দিই, আসলে সেটা ছিল পাগলামির আঠায় জড়িয়ে যাওয়া।

মিতু সেই পুরানো ভঙ্গিতে বলে,

– পাগল নাকি! সে তো ছিল শুধুই ভালোবাসার আঠা!

– ও, তাই বলো।

দুই

মুখে যা-ই বলা হোক, সে আমাদের পাগলামিই ছিল বটে। এই যে আমাদের এই বছর দুয়েকের দাম্পত্য জীবন তা তো মিতুর একতরফা পাগলামির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের চাঁদের দিকে বামনের হাত বাড়ানো নিয়ে সমাজে নানারকম গল্পের চল আছে সে আমি জানি, তেমন আকাশকুসুম দুঃসাহসিকতা কখনো দেখাতে চাইনি আমি। নিজের ওজন এবং অবস্থান সম্পর্কে টনটনে সচেতনতা আমার আছে। মিতু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের শহুরে মেয়ে। তার তুলনায় কী আছে আমার! অশিক্ষিত গেঁয়ো চাষার ছেলে আমি। দারিদ্র্য এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে পদে পদে। আমার অদম্য জিদের কাছে হার মানতে হয়েছে দারিদ্র্যকে। সেই ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছি লেখাপড়ায় আমার মাথা ভালো। প্রাইমারির শিক্ষক অনিমেষ স্যার বলতেন, বকুল আমাদের গর্ব, আমাদের গোবরে পদ্মফুল। মুকুল নামের ভাইটির অকালমৃত্যুর পরে আমার জন্ম। মুকুলের ভাই বকুল। ঝরা ফুলের নামে এই নাম কে রেখেছে আমার জানা নেই। হতে পারে আমার বৃদ্ধা দাদি এ কাজ করেছে। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে সে কথা বলতে পারে, সহজাত কবিপ্রতিভা তার, গুনগুন সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে দুঃখের গান গাইতে পারে; সে-ই বলতো– বকুল ফুলের বাসনা বেশি। 'বাসনা' মানে ওই সৌরভটুকুই আমার অহংকার। তবু আমি অকালে ঝরে যাইনি, পদ্মের মতো উদ্ধত কণ্টকাকীর্ণ বৃন্তের উপরেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি। মিতু পাগলের মতো ভালোবেসেছে সেই পদ্মফুলকে, পদ্মের ডাঁটায় যে কাঁটার অস্তিত্ব তাকে সে পাত্তাই দিতে চায়নি।

আমাদের বিয়ে হয়েছে মিতুর প্রবল পীড়াপীড়ির কারণেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট শেষ হতে না হতেই সৌভাগ্যক্রমে আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি পেয়েছি। নিজের পায়ে দাঁড়াবো, গ্রামে পড়ে আছে আমার মা-বাবা-দাদি, তাদের জন্য কিছু করব, তারপর বিয়ে থা'র কথা ভাবব। না, আমার এ সব পরিকল্পনা একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিতুর অবুঝ আবদারের কাছে। আমার কোনো কথাই সে শুনবে না, বিয়ে করতে হবে তাকে। বিয়েতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সেটার জন্য একটুও অপেক্ষা করা যাবে না কেন, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই; আছে শুধুই পীড়াপীড়ি। আমি ভাবতেই পারিনি কোন জাদুমন্ত্রে সে তার বাবাকে ম্যানেজ করতে সক্ষম হয়েছে। বিজনেস ম্যাগনেট সোবহান চৌধুরী স্থানীয় চেম্বার অব কমার্সের নেতা। বাড়িতে কড়া গার্জেন। মিতুর মুখে তার বদমেজাজি ব্যক্তিত্বের অনেক গল্প শোনা আছে। সেই মানুষ রীতিমতো ধুমধাম করে বিয়ের আয়োজন করেন এবং প্রসন্নচিত্তে কন্যা সম্প্রদান করেন আমার হাতে। সব শেষে ভয়ানক এক শর্তের কথা নির্দেশের মতো করে শুনিয়ে দেন– তার এই শহুরে মেয়েকে তিনি গ্রামে যেতে দেবেন না। মেয়ে-জামাইকে এই শহরে তার বাড়িতেই ধরে রাখতে চান। এই জায়গায় এসে আমি খানিকটা দুর্বিনীত হয়ে উঠি, সসংকোচে নিজের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিই– মোহাম্মদপুরের দুই রুমের ছোট্ট ফ্ল্যাটেই আমরা সংসার পাততে চাই।

সেই আমাদের সংসারযাপন।

সংসারে এসে মিতুর প্রধান কাজ হয়ে ওঠে আমার সকল কাজে পাগলামি আবিষ্কারে তৎপর থাকা। আমি কিছু বললেই হলো, কথায় কথায় সে শুনিয়ে দেবে, 'পাগল নাকি!' এই একই কথা বলতে বলতে সেটাই একরকম মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ সে কথা তার মুখের ওপরে কিছুতেই বলার উপায় নেই। পাগলামিটা যে কার সেটা কিছুতেই তলিয়ে দেখবে না। ঘুরেফিরে আমাকেই শুনতে হবে, 'পাগল নাকি!'

বার বার শুনতে শুনতে একদিন আমি দুম করে বলে ফেলি,
– আমি পাগল নই। আমি ইদু পাগলের নাতি।
– অ্যাঁ! মিতুর চোখেমুখে অপার বিস্ময়!
– তার মানে তোমার বংশে পাগলের ধারা ঠিকই আছে!
আমি সহজেই স্বীকার করি,
– বংশের কথা বলতে পারব না, তবে আমার দাদুর নাম যে ইদু পাগল, সেটা আমি ভালোই জানি।

মিতু সকৌতুকে বলে, তাই তো বলি, পাগল না হলে বড়োলোক শ্বশুরের বাড়ি-গাড়ির মোহ এমন অনায়াসে কেউ ছাড়তে পারে! পাগল আর বলে কাকে!

– না, আমি নই, আমার দাদু ছিল পাগল। একেবারে বদ্ধ পাগল। নাম তার ইদু পাগল।

আমার এই সরল স্বীকারোক্তির কী যে মানে বোঝে মিতু, আমি তার বিশেষ কিছুই টের পাইনে। 'ইদু পাগলের নাতি' বলে আমাকে সে পরিহাস করে বটে, ভেতরে ভেতরে কী যেন ভাবে। তার চোখেমুখে কৌতুকের ছটা অপেক্ষা কৌতূহলের আভাস-ইঙ্গিতই দেখতে পাই। তখন আমিই তাকে পরিহাসের চিমটি কাটি, 'পাগল বংশের বউ হিসেবে তোমার স্ট্যাটাসও কিন্তু মোটেই হেলাফেলার নয়।'

মিতু দু'চোখের ভ্রুভঙ্গে তাকায় আমার মুখের দিকে। কথা বলে না। সঠিক প্রতিক্রিয়াও টের পাওয়া যায় না। অকারণেই এক চিলতে হেসে কী যে বুঝাতে চায় সে-ই জানে। তবে এরপর থেকে যখন-তখন পাগল বলার মুদ্রাদোষ বেশ খানিকটা কমে আসতে দেখা যায়। তাতে স্বস্তি পাবার বদলে আমার যেন অস্বস্তিই হয়। এক অজানা আশঙ্কাও হয়– পাগলামি কি শেষপর্যন্ত বন্ধই হয়ে যাবে! আমার কণ্ঠে গান আসে না ঠিকমতো, তবু কতদিন বেসুরো গলায় মিতুকে আমি মান্না দে'র জনপ্রিয় সেই গান শুনিয়েছি, 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে তার প্রতিবাদ করি আমি– ।'

কী ভেবে যেন মিতুও খুব প্রতিবাদ করে। কিন্তু পরের লাইনে এসে খুব খুশি হয়ে ওঠে, আমার সঙ্গে সেও কণ্ঠ মেলায়–
যখন তুমি আমায় পাগল বলো ধন্য যে হয় সে পাগলামি।
হায়, পাগলামি থেমে গেলে আমাদের চলবে কী করে!

তিন

জন্মগ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দিনে দিনে শুকনো লতার মতো নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছে সে আমি টের পাই, কী যে আমার করণীয় তাও নির্ণয় করতে পারি না। লেখাপড়ার নামে সেই কবে গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে এসেছি, টিউশনি-ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে নিরন্তর ব্যস্ত থাকা, তারপরও ঢাকা শহরের এই পেরেকবিদ্ধ জীবনযাপন; এ সব ছেড়ে গ্রামে যাব কখন! মা-বাবাকে গ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার কথাও ভেবেছি। এ প্রস্তাব শুনে জলের মাছ ডাঙায় তোলার মতো আঁতকে উঠেছে তারা। সর্বোপরি বৃদ্ধা দাদিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও নড়বে না। উঠোনে আছে দাদুর কবর। দিনরাত সেই কবর পাহারা দেয় দাদি। কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেবে না স্বামীর কবর। এ নিয়ে হাসিতামাশাও বিস্তর হয়েছে, সে গায়ে মাখে না কিছুই।

আমার জন্মগ্রামের সঙ্গে শুষ্কপ্রায় সম্পর্কের সুতোটি সম্প্রতি খানিকটা সপ্রাণ হয়ে উঠেছে চাচাতো ভাই তোতার কারণে। একেবারে আপন চাচাতো ভাই নয়, আমার বাবার মামাতো ভাইয়ের ছেলে হাবিবুল ইসলাম তোতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়; সুযোগ পেলেই চলে আসে বাসায়। মিতুর সঙ্গেও খুব ভাব জমিয়েছে। গ্রামের ছেলে এমন চটপটে হলো কেমন করে কে জানে! মিতু সেই তোতার মুখে শুনে শুনেই আমাদের গ্রামের ছবিটা এঁকে নিয়েছে বুকের মধ্যে, অতি সাধারণ যে শ্বশুর-শাশুড়ি, তাদের সম্পর্কেও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে নিয়েছে। আমার সঙ্গে দু'তিনবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাবার পরও কোথায় যেন খানিকটা ঘাটতি ছিল চেনাজানার। সেই ঘাটতি পূরণে আমার চেয়েও অধিক ভূমিকা পালন করেছে তোতা; আমি সেটা বেশ টের পাই। আর সেই জন্যে আমারও খুব ভালো লাগে একটু দূরের এই ভাইটিকে।

আমাদের সেই তোতাপাখি সহসা সেদিন কার শেখানো বুলি যে উগরে দিলো আমার সামনে কে জানে! দুম করে বলে বসে,

– চলো ভাইয়া, আগামী পরশু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।
– আমি তো অবাক, 'পরশু মানে!'
তোতা মুখ খোলার আগেই মিতু এগিয়ে আসে, সে জানায়,
– পরশু মানে পরশু। শুক্রবার। সঙ্গে দুদিন ছুটি নাও।
বিস্ময়ের পারদ আমার চড়ায় উঠতে থাকে, বলেই ফেলি,
– তার মানে তুমিও যেতে চাও নাকি!
আগেভাগে উত্তর দেয় তোতা,

– যাবে যাবে, ভাবীও যাবে। তুমি কিন্তু না-বলতে পারবে না ভাইয়া।
– মাথা খারাপ! পরশু আমাকে চিটাগাং যেতে হবে অফিসের কাজে।
এবার মিতুর কণ্ঠে নেমে আসে অভিমানের জেদ,
– আমি তো জানতাম তোমার সময় হবে না।
– জানতে! কী করে জানতে?
– ঠিকই জানতাম।
– কী মুশকিল! চিটাগাংয়ের প্রোগ্রাম তো আমি আজই হাতে পেলাম!
– আমি যেতে চেয়েছি যে, অজুহাতের অভাব হয় নাকি!
– কী আশ্চর্য! তুমি যেতে চাইছ তোমার শ্বশুরবাড়ি, এ তো বড়োই আনন্দের কথা। আমি কেন অজুহাত দেখাতে যাব!
– তা হলে চলো আমাদের সঙ্গে।
এবার আমি উল্টো দিকে প্যাঁচ কষি,
– তার মানে আমাকে ছাড়াই সব প্ল্যান করা হয়ে গেছে!
– নাহ, আমার এই প্যাঁচেও ফল হয় উল্টো। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে মিতু বলে,
– প্ল্যান করেছি ঠিক করেছি। আমাদের দাদু যে একাত্তরের শহিদ, তা তো কখনো বলনি আমাকে!

আমার মাথায় আকাশভাঙা বিস্ময়, বলে কী মেয়েটা! তার মাথায় কে ঢুকাল এ সব ভাবনা! আমি চোখ পাকিয়ে তাকাই তোতার মুখের দিকে। সে নিজে থেকেই ব্যাখ্যা দেয়,

– 'আমি তো ভুল কিছু বলিনি ভাইয়া।'

মিতু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

– তুমি কখনো বলেছ দাদুর কথা?
– কী বলব! দাদু মারা গেছে সেই কবে!
– মারা গেছে! বলো শহিদ হয়েছে।

লজ্জায় আমি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি। এমন করে তো কাউকে বলতে শুনিনি কখনো। ছোটোবেলা থেকে 'ইদু পাগল' নামেই চিনেছি আমার অদেখা দাদুকে। উঠোনের উত্তরে ডুমুর গাছের সঙ্গে লতায়-পাতায় ঘেরা ঝোপজঙ্গলের ভেতরে দাদুর কবর আছে, সেটাও জেনেছি একদিন শৈশবে দাদির বকুনি খেয়ে। সেই ঝোপের মাথায় পাখির বাসা দেখে আমরা দু'তিনজন বালক পাখির ডিম সংগ্রহের জন্যে জঙ্গলে ঢুকতে উদ্যত হতেই তেড়ে ওঠে দাদি। সেইদিন জানতে পারি যে, এইখানে ঘুমিয়ে আছে আমার দাদু 'ইদু পাগল।'

সত্যি বলছি আমার দাদুর নামের সাথে 'শহিদ' শব্দটি কখনো উচ্চারিত হতে শুনিনি। তার মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণও শুনেছি দাদির মুখে, গ্রামের বারোয়াড়ি গোরস্তানে কবর না দিয়ে সেই দুঃসময়ে কেন লাশ টেনে এনে উঠোনের কোণায় মাটি চাপা দিতে হয়েছে তাও জেনেছি, তবু 'শহিদ' শব্দের বিস্তৃত চৌহদ্দির মধ্যে এই নামের প্রবেশ ঘটতে দেখিনি। আমাদের গ্রামের এক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে পাঞ্জাবি সৈন্যের গুলিতে মারা যায়, কখনো কখনো তাকে শহিদ বলতে শুনেছি বিজয় দিবসের বা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে, তাই বলে আমার দাদুও শহিদ হবে! চিরকাল আমি রাজনীতি-নিস্পৃহ মানুষ বলে বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার সাধনায় মগ্ন থেকেছি, আর কোনোদিকে চোখ মেলে তাকাবার অবকাশ পাইনি; সেই কারণে মিতুর চপেটাঘাতে আমার ভেতর-বাহির থরথর করে কেঁপে ওঠে। তোতা কিংবা মিতু, কারও মুখের দিকেই আমি ভালো করে তাকাতে পারি না। কাতরকণ্ঠে জানতে চাই,

– তোমরা এখন গ্রামে গিয়ে কী করতে চাও বলো তো!

মিতু ঘোষণা করে,

– প্রথমে দাদির সঙ্গে কথা বলতে চাই।
– তারপর?
– অবহেলায় পড়ে থাকা দাদুর কবরটা সংস্কার করতে চাই।
– তারপর আর কিছু?
মিতু হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে,
– তুমি কি পরিহাস করছ?
– মাথা খারাপ! আমার দাদুকে নিয়ে এত পরিকল্পনা, আর আমি কি না–।

এবার সহজ হয়ে আসে মিতু। খোলা মনে সে জানায়– আসছে বিজয় দিবসে গ্রামের মানুষকে ডেকে জানাতে চাই,

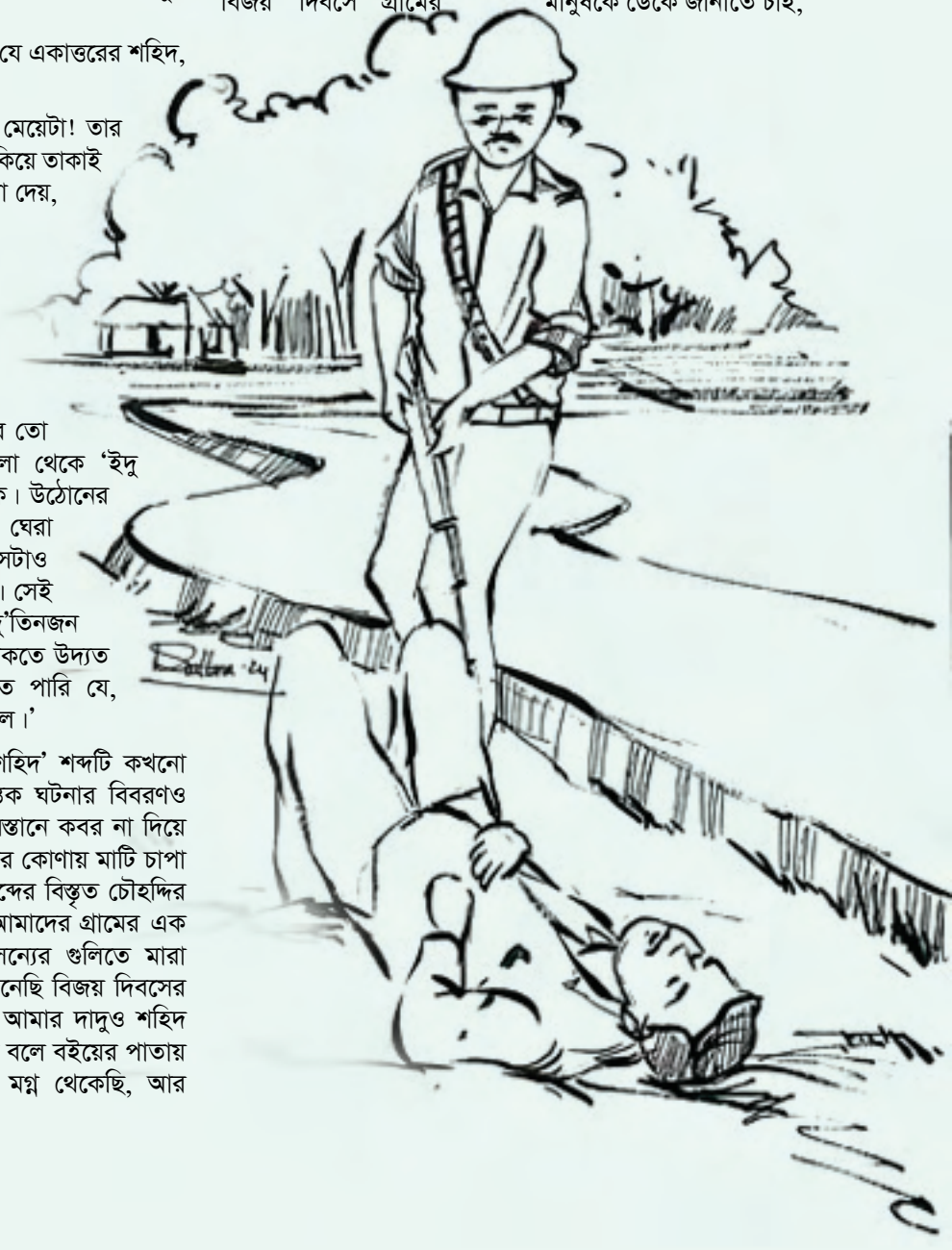

এই যে এটা শহিদের কবর। এখানে ঘুমিয়ে আছেন একাত্তরের শহিদ।

তোতা সংযোজন করে– দাদুই আমাদের গ্রামে প্রথম শহিদ, ভাবী।

আমার তখন দু'চোখের কোণা ভিজে আসে। দাদির মুখে শোনা দুঃসহ সেই দিনের গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। গ্রামে মিলিটারি আসছে শুনে সবাই যখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, ঘরবাড়ি ছেড়ে বাঁশবাগানে ঝোপজঙ্গলে কিংবা বিলের ধারে আশ্রয় নিতে ত্রস্ত-ব্যাকুল, আমার দাদু তখন বীরদর্পে এসে দাঁড়ায় রাস্তার পাশে পুকুরপাড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বছরের প্রথম বৃষ্টি নামার তোড়জোড় চলছে। এ সবে দাদুর কিছুই যায় আসে না। যেনবা একাই সে মোকাবিলা করবে সব আক্রমণ। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ওপরে। দাদিও কেমন অবলীলায় বলে যায় – 'পাগল যে! ভয়ডর বলে তো কিছু নাই।'

তারপর যা হবার তা-ই হয়েছে। পাকিস্তানি মিলিটারির ব্রাশ ফায়ারে তার বুক ঝাঁজরা হয়ে গেছে। রাস্তার পাশে লাশ পড়ে থেকেছে দুদিন। শেয়াল-কুকুরের মুখ থেকে রক্ষা করে অবশেষে সেই লাশ এনে মাটিচাপা দেওয়া হয় উঠোনের উত্তর কোণায়। আমার বাবা তখন দু'বছরের শিশু, পিতৃবিয়োগের কোনো স্মৃতি তার মনে নেই বললেই চলে। ফলে তার কাছ থেকে নয়, দাদুর পাগলামি সম্পর্কে যেটুকু জানার তা দাদির কাছেই শুনেছি, জেনেছি। আমার দাদিও কখনো তার অকালপ্রয়াত স্বামীকে শহিদ বলে জানেনি, আমাকেও জানায়নি।

এতদিন পরে মিতুর কণ্ঠে পবিত্র এই শব্দটি শুনে বুকের মধ্যে আলো ঝলমলে রোদ ওঠে, এক সঙ্গে ডেকে ওঠে হাজার পাখি, উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে যায় তেরোশত নদী। উৎফুল্ল চোখেমুখে আমি তাকাই তোতার মুখের দিকে। ঢাকায় এসে সে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে মেতে উঠেছে শুনে একদা আমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম, একটুখানি তিরস্কারও করেছিলাম; আজ মনে হয় রাজনীতি করে বলেই তোতা আমাদের দাদুকে শহিদের মর্যাদায় শনাক্ত করতে পেরেছে। নইলে ইদু পাগল তো সারা গ্রামে অতি সাধারণ ঘোর নির্বোধ ইদু পাগলই মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। তোতার কাঁধে হাত রেখে আমি জিজ্ঞেস করি,

– এত কথা তুই কখন বলেছিস তোর ভাবীকে?
– কোন কথা?
– এই যে আমাদের দাদুর শহিদ হবার কথা!
এতক্ষণে হেসে ওঠে তোতা,
– না বললে চলে! বাড়ির বউ হিসেবে সব কথা জানার অধিকার ভাবীর আছে।
– এবার তাহলে ভাবীকে সঙ্গে নিয়েই মাঠে নামবি?
– না না, তুমিও থাকবে। তোমাকেও সঙ্গে নেব। আমরা যদি না বলি, আমাদের দাদুকে সবাই শহিদ বলে জানবে কেমন করে?
কী ভেবে কে জানে, মিতু সহসা পরিহাস করে ওঠে,
– পাগল নাকি!

একযোগে হেসে উঠি আমরা তিনজনই। হাসির লাগাম টেনে তোতা হঠাৎ প্রস্তাব দিয়ে বসে,

– পরশু না হয় না হোক, তুমি একবার বাড়ি চলো ভাইয়া। আমি গ্রামের সবাইকে ডেকে একত্রে জড়ো করব। তুমি সবার সামনে শহিদ ইমদাদুল হক ইদুর কথা তুলে ধরবে। গ্রামের মানুষ তোমাকে খুব ভালোবাসে, মান্য করে, তুমি বললে শুনবে নিশ্চয়ই।

– বাড়ি তো যাবই। কিন্তু সবার সামনে কী বলব আমি?

এবার প্রস্তাবটা খোলাসা করে মেলে ধরে তোতা,

– আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের নাম বদলে প্রথম শহিদের নামে নামকরণ করতে হবে।

– 'মাথা খারাপ!' আমি ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাই, এমন কথা আমি নিজে মুখে বলতে পারব না।

– আর যদি গ্রামের লোকজনই এই সিদ্ধান্ত নেয়, তখন?

– তখন আমি আর কী বলব! সাধ্যমতো সহযোগিতা করব।

মিতু দুহাত নেড়ে বিজ্ঞের মতো জানিয়ে দেয়,

– এসব ভাবনা এখন থাক। গ্রামে গিয়ে প্রথমে শহিদের কবরটা সংস্কার করে জানিয়ে দিই– এটা শহিদ ইমদাদুল হক ইদুর পবিত্র সমাধি। আসুন আমরা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

সহসা মিতুকে আমার অনেক বড়ো মনে হয়। আমার চাচাতো ভাই তোতাকেও খুব বড়ো মনে হয়। দুজনের দিকে তাকিয়ে আমি ঘোষণা করি,

– আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। তোমরা গিয়ে কাজ শুরু কর। আমি আসছি।

– 'পাগল নাকি!' মিতু আবারও তার মুদ্রাদোষে ফিরে যায়। তারপর এক চিলতে হেসে যোগ করে, 'তুমি চিটাগাং থেকে ফিরে এসো। আমরা না হয় আরও কদিন পরেই শুরু করি শুভ কাজ।'

মিতুর কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগে। আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেলি,

– শহিদ ইদু পাগলের নাতি পরিচয়ে আমার খুব গর্ব হচ্ছে।

তোতাও কণ্ঠ মিলিয়ে বলে,

– আমিও শহিদ ইদু পাগলের নাতি।

গালে টোল ফেলে মিতু হেসে বলে,

– আর আমি!

-o-

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

শেখ মুজিবের ছবি

আ. শ. ম. বাবর আলী

ইতিহাসের বীরকাহিনি লিখতে যখন বসলাম,
কলম থেকে ঝরে পড়ে শেখ মুজিবের নাম।
লিখতে গল্প যখন জাগে মনের মধ্যে ইচ্ছা,
হয় যে লেখা শেখ মুজিবের নির্ভীক জীবন কিচ্ছা।

যখনই চাই মনটা খুলে গাইতে খুশির গান,
কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে মুজিবুর রহমান।
হতে যেয়ে শিল্পী সাহিত্যিক গায়ক কিংবা কবি,
সবখানেতে দেখি আমি শেখ মুজিবের ছবি।

আমার সকল চিন্তাভাবনা এবং সকল কাজে,
মুজিব ছাড়া অন্য কিছু মনে আসে না যে।
এই দেশেরই ফুলে ফলে নদীর কলতানে,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর আছেন সবার প্রাণে।

একাত্তরের যোদ্ধা বাবা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

কে যেন রে সুদূর থেকে আমায় শুধু ডাকে
মনে পড়ে বেহেশতবাসী আমার বাবা-মাকে
পাননি বাবা কবর গড়ার এক টুকরো মাটি
যুদ্ধে শহিদ হয়েই বাবা হলেন জীয়নকাঠি।

একাত্তরের মার্চে যখন উঠলো প্রবল ঝড়
দেশের টানে ছাড়েন বাবা প্রাণের প্রিয় ঘর
যুদ্ধে শহিদ হলেন তিনি, পাইনি খুঁজে লাশ
জলাঞ্জলি দেননি কোথাও আদর্শ-বিশ্বাস।

বাবার কবর হয়নি গড়া, কবর সারা দেশ
তাই সইতে পারি না এই দেশের কায়ক্লেশ
দেশটা যেন মায়ের অশ্রু বাবার রক্তে গড়া
আমার দেশের রূপেই সাজে পূর্ণ বসুন্ধরা।

প্রিয় দেশের রূপ-মাধুরী ডাকে যে পইপই
বাবার কবর হয়নি তবে মায়ের কবর কই
বাড়ির পাশে মায়ের কবর, জীর্ণ যেন সবি
হৃৎ-গহিনে আঁকা আছে বাবা-মায়ের ছবি।

একাত্তরের যোদ্ধা বাবা, বীর সন্তান তিনি
তাঁকে নিয়েই গর্ব করি তাইতো প্রতিদিনই
শহিদ হয়েও তিনি হলেন গর্বিত এক সেনা
বাঙালি সেই স্মৃতিটুকু কখনো ভুলবে না।

আমাদের কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু

মিলন সব্যসাচী

পদ্মা মেঘনা মধুমতী তুরাগ তিতাস কুমার কীর্তিনাশা
হাজার নদী বেষ্টিত জনপদে মুখরিত এই বাংলাদেশে
কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু বীর বাঙালি জন্মেছিলেন
টুঙ্গিপাড়া গ্রামের টুকটুকে লালকৃষ্ণচূড়া আর অবারিত
সবুজের সমারোহে সুশোভিত স্নিগ্ধ ছায়ায়।

সবুজ ঢেউ দোলানো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের কিষান
পল্লির মেঠোপথ সুনীল আকাশ বাউল বাতাস
সাধক লালনের হৃদয় নিঃসৃত সুরের একতারা
বিজয়ের বিচ্ছেদ বেদনায় সিক্ত মর্মস্পর্শী গান।
বিলে ঝিলে হাওরে বাঁওড়ের কাকচক্ষু জলে
সুপ্রভাতে শুভ্রতার পসরা সাজানো ফুটন্ত শতদল
ঘুম ভাঙানো দোয়েলের মিষ্টি গানের সুমধুর সুর
রূপসি বাংলার গ্রামীণচিত্র মায়ের মতো মাতৃভূমি।
নদীর বুকে পাল তোলা নায়ের রঙিন মাঝি
চিরচেনা দৃশ্যের মর্মমূল ছুঁয়ে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে
লাউয়ের ডগার মতো বেড়ে উঠেছিলেন কিশোর মুজিব।
বইচি বনের উদাস দুপুর ঘুঘু ডাকা বাবলাবন
ডাহুকের ডাকে মুগ্ধ মুখর বেতশবনের অলস প্রহর
আলপথে হেঁটে হেঁটে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া গুচ্ছগ্রাম
পথের তুচ্ছ তৃণদল, গুল্মলতা, গুবাক তরুর সারি
গোধূলির সিঁদুর-রাঙা আবির মাখা স্বপ্নীল সন্ধ্যা
জোনাক জ্বলা রাতের আকুলতা ঝিঁঝি ডাকা রাত
মসজিদ মন্দির প্যাগাডো অন্যান্য ধর্মশালার টানে
গ্রামবাংলার সরল সহজ মানুষের ভালোবাসায়
প্রকৃতির সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন
সম্প্রীতির নিবিড় বন্ধনে আমিত্বহীন মহামানবের পাঠ
হৃদয়ের সবটুক ভালোবাসা দিয়ে বিশাল বুকের জমিনে
রোপণ করেছিলেন মানবিক বোধের তীর্থ-বীজ
নিপীড়িত মানুষকে ভালোবেসে নিজেকে নির্মাণ করেছিলেন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতায়

গোলাম নবী পান্না

পাখি ওড়ে ডানা মেলে নীল সীমানায়
আকাশেই ফুরফুরে হিমেল হাওয়ায়।

উড়ে উড়ে সুরে সুরে গান গেয়ে যায়
বাধা নেই উড়তেই স্বাধীনতায়।

দেশজুড়ে স্বাধীনতা জাতি পেতে চায়
প্রাণ যায় যুদ্ধে, তাই মেতে হায়!

লড়াই না করে জাতি মুক্তি কি পায়?
প্রাণ দিয়ে শোধ হয় এমন এ দায়।

তারপর দুখ ভুলে এ জাতি দাঁড়ায়
পৃথিবীর বুকে এক উঁচু তালিকায়।

পিতা তুমি রয়েছ এ হৃদয়জুড়ে

দেলওয়ার বিন রশিদ

পিতা তুমি রয়েছ এ হৃদয়জুড়ে রয়েছ জেগে
ভোরে শিশিরস্নাত দূর্বা ঘাস মাড়িয়ে
যখন হেঁটে যাই
ধানি জমির আল ধরে
তখনও তুমি থাকো আমার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষায়
আমার চৈতন্যে,

বিস্তৃত সবুজে তোমার স্পর্শ পাই,
তুমি সবুজ বাংলা, শ্যামলছায়া
তুমি আমার স্বাধীনতার অনুভব
বাতাসে কান পেতে তোমার বজ্রকণ্ঠ শুনি,

তোমার উদাত্ত আহ্বান
প্রত্যহ আমায় উদ্দীপ্ত করে,
আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সম্মুখে হেঁটে যাই,
জড়তা ভয় পেছনে পড়ে থাকে।
আমি কেবলই তোমায় অনুসরণ করে
দূরে দৃষ্টি মেলে দিই, আশায় বুক বাঁধি।
এদেশের মাটির ঘ্রাণে তোমায় পাই
তুমি পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাজুড়ে তোমার স্বর্ণাভ নাম,
তুমি মিশে আছ এই সবুজে ফুলে ফুলে,
তুমি তো রয়েছ স্বদেশের মানচিত্রে, সবুজে লাল পতাকায়
লাল পতাকাজুড়ে তোমার মুখচ্ছবি দেখি।
পিতা তুমি রয়েছ এ হৃদয়জুড়ে।

প্রিয় স্বাধীনতা আমার

শচীন্দ্র নাথ গাইন

রূপকথা নয়, নয় মোটে তা কল্পলোকের গল্প
দাদুর মুখে নাতির শোনা সেই কাহিনির অল্প।
মিথ্যে তাতে একটুও নেই, একশত ভাগ সত্যি
পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দত্যি।

সবাই ওরা পাকশাসকের লেলিয়ে দেওয়া যোদ্ধা
বীভৎসতায় মাতলে লোকের পায় শুধু অশ্রদ্ধা।
গ্রাম-জনপদ পুড়তে থাকে দাউ দাউ দাউ অগ্নি
আর্তনাদে বাতাস কাঁপায় মা-বাবা ভাই-ভগ্নি।

গুলির ঘায়ে ঝাঁঝরা করে নিরস্ত্রদের বক্ষ
করবে এদেশ শ্মশানভূমি, এটাই ছিল লক্ষ্য।
বর্ণনাতীত নির্যাতন ও মানুষ করে হত্যা
চিরতরে নিভাতে চায় বাঙালিদের সত্তা।

বীরের জাতি হয়নি নত শির রেখেছে উচ্চ
তাদের কাছে হায়েনাগুলো হার মেনে হয় তুচ্ছ।
পশ্চিমারা ঠিক জেনেছে বাঙালি কী শক্ত
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে বিলিয়ে বুকের রক্ত।

‘এবারের সংগ্রাম’ সে-ই অমর উক্তি

খোরশেদ আলম নয়ন

স্বাধীনতা বাঙালির স্বপ্নের ঠিকানা
পথহারা পথিকের স্বপথের দিক আনা,
স্বাধীনতা শত ফুল ফোটা প্রিয় শতদল
স্বাধীনতা নির্ভীক জনতার মনোবল।

স্বাধীনতা এ জাতির মুক্তির চেতনা
স্বাধীনতা ছাড়া কেউ পথ খুঁজে পেত না,
ফুলে আর ফসলে ভরা এই দেশটা
যৌথ স্বপ্ন নিয়ে করে গেলে চেষ্টা–

আমরাও একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবো
নতুন দিগন্তে দুই হাত বাড়াবো,
যে মাটি দিয়েছে প্রেম-ভালোবাসা জননীর
যে মাটিতে মিশে আছে তিরিশ লক্ষ বীর;

যে মাটির বুক চিরে স্বাধীনতা এনেছি
হারানোর বেদনাকে নিভৃতে মেনেছি।
মুছে ফেলে মন থেকে গ্লানি আর সংঘাত
স্বদেশের উপকারে রাখি আজ হাতে হাত!

লাল-সবুজের এই পতাকায়ই মুক্তি
‘এবারের সংগ্রাম’ সে-ই অমর উক্তি!

বাংলায় হাসে মুজিবুর

নাটু বিকাশ বড়ুয়া

শিল্পী বসে ছবি আঁকে
লাল-সবুজের রং দেখে
তুলোট মেঘে পাখির উড়া
স্বাধীনতার রূপ মেখে।

গর্জে উঠে বীর বাঙালি
মুক্তি চাই স্বাধীন কর
বীর জনতা মিলে সবে
শত্রুদের খতম কর।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
অস্ত্রহাতে যুদ্ধ চালায়
শক্ত ঘাঁটি করে।

পাখির গানে মধুর সকাল
মাখলো দেশে রূপের সুর
পুবের আকাশ রং মেখেছে
বাংলায় হাসে মুজিবুর।

লড়বো জনমভর

শাফিকুর রাহী

আগরতলার ষড়যন্ত্রে কোন সে মহা বীর;
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন উর্ধ্বে তুলে শির!
কোনো বাধাই মানবো না আর আমরা করবো লড়াই
অধিকার আদায়ের যুদ্ধে কাউকে কি আর ডরাই!
সামনে হবে তুমুল লড়াই লাগলে আগুন লাগ
পাক-দখলদার স্বৈরশাসক এ দেশ ছেড়ে ভাগ।

একাত্তরের নয় মাস ধরে যুদ্ধেরই ময়দানে
শক্তি ও সাহস জোগায় সব মানুষের প্রাণে!
কার সে কণ্ঠ-কারুকলায় বীর তারুণ্য জাগে;
বীর বাঙালির আকাশ দাওয়ায় মুক্তির হাওয়া লাগে!
বাঁশের লাঠি লগি বৈঠায় বীরগেরিলা ছোটে;
কার মানবিক আহ্বানে বারুদ হয়ে ফোটে!

বীরজনতা মুক্তিযোদ্ধা রক্তগঙ্গার পাড়ে;
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার দীপ্ত অঙ্গীকারে!
মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ভালোবেসে মাকে;
কার বজ্রনিনাদে সেদিন কোটি মানুষ জাগে!
অত্যাচারী পশ্চিমা ওই বর্গিগুলো ভাগে?

তিনি হলেন বাংলা মায়ের চিরকালের সাথী
তাঁর সে বিরল অভিযানে যুদ্ধজয়ে মাতি–
যাঁর মহৎ মহিমায় আমরা অহিংস সংগ্রামে
স্বাধীনতার স্বপ্নে ব্যাকুল বিপ্লবী উদ্দামে।
কে সে তিনি; কী নাম তাঁহার; পড়ছে মনে কারো?
যাঁর সে ত্যাগের অমরগাথায় গড়তে জীবন পারো।

যাঁর ডাকেতে লক্ষ মানুষ জীবন করে দান
বীর বাঙালির পরম আপন মৃত্যুহীন এক প্রাণ।
তাঁর মহান আদর্শে আমরা লড়বো জনমভর
মহাকাব্যের জনক তিনি নামটি মজিবর।

স্বাধীনতাই অহংকার

ইমরুল ইউসুফ

ঢেউ তোলা বেহুলা বাতাস
জনগণের কোটি কণ্ঠস্বর
এঁকে যায় স্বাধীনতার প্রতীমা।

রংধনুর সাতরঙে বিজয় বসন্ত
কোকিলের পালকে আঁকা ক্ষণ
ছুঁয়ে থাকে ইতিহাসের চিত্রকলা।

সমুদ্রের শঙ্খচূড়ে অপেক্ষার রাত
নীলাম্বর মেঘ খোঁজে জ্যোৎস্না
স্বাধীনতার স্বর্ণদুয়ারে ভোরের আলো।

বালুচরে অবারিত বাংলার বুনন
খেয়ালি জল ধুয়ে দেয় সৌরভ
মায়ার পৃথিবীতে স্বাধীনতাই অহংকার।

দীপ্ত শিখা

দেবকী মল্লিক

'তুমি আজ কত দূরে'– ভাবি যবে মনে,
চোখের নিমেষে ভাসে, এই আছো সনে!
মাঠে-ঘাটে, রাজপথে, হাসিখুশি মুখে,
তর্জনী উঁচিয়ে বলো, থাকো সবে সুখে।
অভয় বাণীর তেজে, নিরস্ত্র বাঙালি,
ধরিল লাঠি, দা, খুন্তি, জাগালো ধমনী!
তেজোদীপ্ত প্রাণে তাঁরা– শোষকের প্রাণ,
নয় মাসে চুরমার, করে খান খান!
হায়! নরপিশাচের তাণ্ডবলীলায়
মুহূর্তে নিথর দেহ, লুটায় ধূলায়!
তোমার বজ্র নিনাদ, নিঃশেষ না হবে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বাধীনতা, আজীবন রবে!
কাল হতে কালান্তরে, বাঙালিরে যবে,
চেতনার দীপ্ত শিখা, 'মুজিব' জ্বালাবে।

স্বাধীনতার লাল সূর্যকে

লিলি হক

মনে পড়ে সেই গনগনে তপ্ত রাজপথ
মিছিল মিটিং দুর্বার আয়োজন,
স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে
অগণিত জনতার দৃঢ় প্রত্যয়
মৃত্যু ভয়ে এতটুকু ভীত নয়।

রক্ত স্রোতে লাল হয়েছে বাংলার
সবুজ ঘাস, বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষ্যার পানি।
চোখের সামনে ভেসে উঠে,
আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া
মগড়া নদীর দৃশ্য। কোন লাশ হাত বাঁধা
কোনটা পেট ফুলে আছে বীভৎস চেহারা নিয়ে।
স্মৃতির অ্যালবামে ভাসছে দৃশ্যগুলো,
ঝুপ করে পড়া লাশের শব্দ মগড়ার
পুলের উপর থেকে, সারাদিন ধরে যাঁদের
হানাদার বাহিনীর বর্বর পশুরা ধরতো,
সন্ধ্যায় সারি বেধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে
ফেলে দিত মগড়া নদীর গর্ভে,
হাঁপিয়ে উঠতাম স্বজনহারাদের চিৎকারে।

বিধবা স্ত্রী, সন্তানহারা মা, উহ ! কী বেদনাকাতর স্মৃতি।
তাই ভাবি এত রক্তের প্রতিদানে পাওয়া স্বাধীনতা
আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য কীভাবে রক্ষা করছি,
কী করে আমরা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করবো ?
আমরা কি জেগে আছি,
না ঘুমিয়ে আছি ?

এ মাটি আমার

তাহমিনা কোরাইশী

চারদিকে লাশ পড়ে থাকা শহর বন্দর গ্রাম
নদনদী, ঝোঁপ-ঝাড়, শালবন চষে বেড়িয়েছি
রণাঙ্গনে যোদ্ধা আমি নিদ্রাহীন শত রজনী পেরিয়ে এসেছি
রাইফেল, বেয়নেট, এসএলআর, ডিনামাইট
বারুদ বোমার সরঞ্জাম
কাঁধে নিয়ে দূর-দূরান্ত পথ হেঁটেছি।
নারী তোমার সম্ভ্রম হারিয়েও তুমি দীপ্ত পদক্ষেপে
রণক্ষেত্রটি দখলে নিয়েছো
মুক্তিযুদ্ধে পিছিয়ে পড়নি তুমিও
জয়-পরাজয় উত্থান-পতনের দামামা চলছিল বেজে
নিপীড়িত-নির্যাতিত অধিকার বঞ্চিত আমরাই
জেগে উঠেছিলাম রূঢ়-ভয়ংকরী প্রতিবাদী সত্তায়।
নিজ গৃহে পরবাসী জীবনের সমাপনী যুদ্ধে
মরণের পথটি সহজ হলেও প্রতিরোধ-প্রজ্ঞায় আছি সাহসে
সদা জাগ্রত নির্ভীক সৈনিক আমি
ভালোবাসার জয় চিরন্তন নিজস্ব স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত
কালজয়ী ইতিহাস আমাদের মহাকালের খেরখাতায়
ধ্বংসলীলার মাঝে জয়ের পতাকা ওড়ানো ছিল না সহজ
মুক্তিসেনারা দুর্বার দুর্মর প্রতিরোধে ছিনিয়ে এনেছে জয়ের তাবিজ
গাঢ় প্রখর সোনালি আভায় এক পৃথিবী সুখ আমার।
এই বুকজুড়ে আনন্দ ধ্বনি জয় বাংলা স্লোগানে স্লোগান
পেয়েছি লাল-সবুজের একমুঠো জমিন
আকাশ সমান চিৎকার করে বলেছি
মা তোমায় ভালোবাসি জন্ম-জন্মান্তর
মুক্তিযুদ্ধের রক্তবীজে উর্বর ফসলি জমি তুমি
তুমি আমার অহংকার।

হাজার বছরের ধন

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

সকলের দুখে হয় দুখ তাঁর, সকলের সুখে সুখ
ছোটোখাটো নন তিনি অসাধারণ! পৃথিবী সমান বুক।
তাঁর ডাকে জাগে শহর নগর গ্রাম গাঁও পাড়াতলী
তাঁর হাতে ফোটে সত্যের আলো স্বাধীনতা-ফুলকলি।

তাঁর সামনে অন্যায় নত দুর্নীতি পায় না পার
তিনি বাংলা-বাঙালির খাঁটি দুর্জয় হাতিয়ার।
পর্বত সমান উচ্চতা তাঁর আকাশের মতো মন
মহান তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের ধন।

তাঁর সুরে বাজে সংস্কৃতি-রূপ, তাঁর সুরে বাজে গান
বিশ্বাসে তাঁর আর নিশ্বাসে তাঁর বাংলাদেশের প্রাণ।
সে মহৎ প্রাণ মা'র সন্তান যাঁর ছিল না কোনো তুল
হায়েনা মেতেছে তাঁকেসহ তাঁর পরিজন হোক নির্মূল।

হায়েনার আঁচ বিপদের সাঁঝ স্বদেশের বুকে ঘনঘটা
অজানার বাঁকে হারিয়েছি তাঁকে রেখে যান আলোকছটা।
রেখে যাওয়া আলো সকল অগোছালো সকল অন্ধকার
একে একে দেন অবিরত খুলে সকল বন্ধ দ্বার।

স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা

আরিফ মঈনুদ্দীন

আত্মপক্ষ সমর্থনের আগেই যদি ঝুলে পড়ি
অথবা আমাকে ঝুলিয়ে কেউ অপার
আনন্দ লাভের কসরতে ঢালতে থাকে
ঘি মধু কিংবা অন্য জ্বালানি,
আমি কিন্তু থেমে থাকবো না–
হাত পা বাঁধা হলেও শরীরে ঝড় বইবে
রোমকূপে কূপে বিদ্রোহের ঝড়ো বাতাস আমাকে
উসকে দেবে– মুখর শব্দপুঞ্জের সৌজন্যে
কঠিন আঘাতে অধরোষ্ঠ গলে
বেরিয়ে পড়বে অবিরাম–
স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা শুধু
আর কিছু তো উত্তম নেই এর থেকে।

তারপর যদি ঠোঁট সেলাইয়ের আয়োজনে মেতে ওঠে তারা
দৃষ্টির অনল বর্ষণে ছারখার হবে তাদের সব আয়োজন,
চোখ ফেটে রামধনুর মতোন পুরো লোকালয়ে
ভেসে উঠবে স্বাধীনতার সগৌরব রশ্মি

অতঃপর চোখ বেঁধে যদি নেভানোর চেষ্টা করে আলোর ঝলক
তাতে নেমে আসবে যে অন্ধকার
সেটাই আমার একান্ত ভরসা
কারণ, আমার আলোর মহান কারিগর বাস করেন সেখানে–
ঘুটঘুটে আপাত অন্ধকারে বসে কী নিখুঁত তিনি
চাষ করে চলেছেন আলোর জমিন

তোমাদের আর সাধ্য নেই স্বাধীনতা হননের
কারণ, আমার চোখ বন্ধ বলেই দেখছি অদেখা সকল।

লাখো প্রাণের রক্তবানে

অরণ্যগুপ্ত

সারা বাংলায় ট্যাংক-কামানের ভয়ার্ত গর্জনে
অতর্কিতে হামলে পড়ে জীবননাশী রণে।
মুক্তিযুদ্ধে বীর গেরিলা স্বাধীনতা আনতে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রেনেড বুকে দূর পাহাড়ের প্রান্তে।
কেউ মানে না কারো বাধা; লড়তে হবে লড়বো,
শপথ নিলো বঙ্গবিচ্ছু দেশটা স্বাধীন করবো।

পাকিস্তানি দত্যিদানব বীভৎস উল্লাসে,
লাখো প্রাণের রক্তবানে সোনার বাংলা ভাসে।
গণহত্যার নির্মমতায় শোকেরই সন্তাপে;
আকাশ-বাতাস চমকে উঠে মা-বোনের বিলাপে।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর সন্তানে
সাহস বুকে যায় এগিয়ে জয় বাংলার গানে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অমর ইতিহাসে,
লাল-সবুজের আঁকলো ছবি বাংলারই আকাশে।
মৃত্যুর কাছে হার মানেনি যোদ্ধা বীর তারুণ্য,
নির্বিচারে মারলো মানুষ পাকিস্তানি বন্য।
বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে জীবন-মরণ যুদ্ধে;
বাঁধনহারা লড়াই করে শত্রুদের বিরুদ্ধে।

আমরা স্বাধীন বীরের জাতি

শাহীনূর রহমান রিয়াদ

একাত্তরে বাংলাদেশে বর্গি দিলে হানা–
বলতে কথা পারবে না কেউ কাঁদতেও নাকি মানা।
গণহত্যার নিদানকালে শাসক পাকিস্তানি
বাড়ি-ঘরে জ্বালিয়ে আগুন বাড়ায় পেরেশানি।
অত্যাচারি পাকিস্তানি জান্তার অবিচারে
নির্বিচারে মারলো মানুষ ভয়াল অন্ধকারে।

বীর গেরিলা ট্রেনিং নিলো খান সেনাদের ধরতে
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে বীর দাপটে লড়তে।
সামরিক শাসক টিক্কা খানের দুঃশাসনের কালে
ভাটিয়ালি গান থেমে যায় মাঝির নায়ের পালে।
স্বাধীনতার দীর্ঘকালেও হয়নি তাদের হুশ!
আবোল-তাবোল বলছে আজও হয়ে যে বেহুশ।

আমরা স্বাধীন বীরের জাতি বীরবেশে লড়বো
মুক্ত আলো বাতাস পেয়ে হাওয়ার রথে চড়বো।
লাখো মানুষ শহিদ হলো মহান মুক্তিযুদ্ধে
জ্ঞানে মানে যুদ্ধজয়ে আমরা সবার ঊর্ধ্বে।

বন্ধন মুক্তির দিনে

মনির জামান

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
টুপটাপ শিশিরের শব্দের মতন শুনি আয়ুর পতন
ঝাউবন হতে ভেসে আসে জীবন-মৃত্যুর বাতাস
দুটি জীবনের মাঝে শুয়ে অনুভব করি জীবনের স্পন্দন,
অমনোযোগী চাঁদের মতো আমিও কী তবে
ঝুলে আছি সকালের নৈঃশব্দে?

খ্যাতি কুড়াতে গিয়ে যে ফুল অবলীলায় ঝরে ঝরে পড়ে
তারও কী একবার নিজেকে দেখবার সাধ জেগেছিল?
ফেঁটে পড়বার আর্তনাদে ডালিম যতবার তাকিয়েছে মূলে
ততবারই কীট ভেবে কীটনাশক গিলে ফিরে গেছে পাখিদল।

নেশাতুর ঘুমচোখে প্রহরগোনার গান আর শোনা হয় না গাছেদের
ধীর বিষে বিষময় শরীর এপাশ-ওপাশ করে
কলিযুগের নিষ্ফলা সফেদার মতো দাঁড়িয়ে থাকা আর কতক্ষণ?

কিন্নর মুরলি যে মাঠে বেজেছিল;
খোদার মিতা যে মাঠে রাখাল সেজেছিল
সেই মাঠের প্রান্ত ছুঁয়েই একাকী সূর্যের হাত ধরে
আমিও কল্পনার রঙে রঙিন মেঘেদের অসীমে ভিড়ে যাবো
জীবন-জগৎ, সম্পর্ক কাউকে বাঁধতে পারেনি কোনোদিন,
কোনোকালে!

মাহে রমজান

নুরুল ইসলাম বাবুল

রমজান এলে সাধনার দিন আসে,
সিয়াম পালনে মুমিন হৃদয় হাসে।
প্রতি মুসলিম খাস নিয়তের সাথে,
সেহরি খেতেই উঠে পড়ে শেষ রাতে।
সারাদিন ভর খায় না খাবার পানি,
খোদার খুশির জন্য এসব জানি।
পুরো একমাস এমন ত্যাগের মাঝে,
বান্দা কাটায় ইবাদতময় কাজে।
মুসলমানের ঘরে ঘরে রোজাদার,
এই মাস চায় অন্তরে বার বার।
রমজান এলে মুমিন হৃদয় হাসে,
রোজাদারকেই আল্লাহ ভালোবাসে।

বসন্তের চিঠি

রোকসানা গুলশান

কেন সে এত দ্রুত চলে যায়?
কাঠবাদামের রোমান্টিক লালেরা যাচ্ছে ঝরে,
দেখার আয়েশ কই? ইস!
খেরো খাতা অপেক্ষায় আছে পড়ে,
আমনের ঘ্রাণ লাগা কবিতাখানি পূর্ণতার আশায়–
শীতের মনোহারী উত্তাপ কেন এত স্বল্প থাকে?
কেন বাগানের রকমারি শোভার হয় না অবকাশ খোঁপায় সাজবার?
অধৈর্য কোকিল কেন ডেকে ডেকে ভুলিয়ে দিয়ে যায় সব–
'তাহারেই পড়ে মনে' তবু পাই না কেন, আহারে!
আইল্যান্ডের ঘুমন্ত পাতার দীর্ঘশ্বাস
পৌঁছায় না ভুবন চিলের ডানায়।

দিনের আলো যাচ্ছে দূরে সরে
কেন দিননাথ রাখে না দৃষ্টি–
'কেউ কি আসে?' চোখের সে মায়ায়–
কী যেন এসে ধাক্কা খায়?
উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকা নিভৃত মন–
কেন কথা-অনুভবে বোঝাই হয়ে যায়?

হায় সময়! তোমার কিউব কেকের টুকরোগুলো
মহাকালেই হারায়?
কিছুতে পাইনে তাহারে অবসরের প্লেটে!
কিছুতে ছুঁতে পাই না যেমন ভেষজ সবুজ সুবাস।
শুধু ডোপামিন দীর্ঘশ্বাস–
বাঁচিয়ে দেয় বার বার
ভালোবাসিবার নির্মল নিরাময়,
হায় লুকোচুরি সময়!
আমরা শুধুই খেয়ালির খেলোয়াড়!

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভবনে 'South Asian Constitutional Courts in the Twenty-First Century: Lessons from Bangladesh and India' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

পিএসসির কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নির্দেশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)-এর প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২৮শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশনের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' পেশ করলে তিনি এ নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, দেশের মেধাবী তরুণরা যাতে তাদের মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে জনগণের সেবার মনোভাব নিয়ে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে পারে সেই লক্ষ্যে পিএসসিকে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা ও সময়সীমা কমিয়ে আনতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোসহ কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার উপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি। তিনি নিয়োগ কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ দেন ।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, বাছাই প্রক্রিয়ায় চাকরি প্রার্থীদের দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কিত বিষয়াদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। পিএসসির কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি আশা করেন ভবিষ্যতে পিএসসি আরও গতিশীল হবে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

দরিদ্রদের জন্য চিকিৎসাসেবা সহজ করার ওপর জোর রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে 'চতুর্থ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ২০২৪' উদ্বোধনকালে দরিদ্রদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজ করতে চিকিৎসক, নার্স ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রতি নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, গরিবদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা (গরিব) যেন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয় বা অর্থের অভাবে অবহেলিত না হয়। বাংলাদেশ কার্ডিওভাসকুলার রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং ইউএসএ ইন্টারভেনশনাল একাডেমি এ সম্মেলনের আয়োজন করে। অবৈধ হাসপাতাল-ক্লিনিক বা ভুয়া চিকিৎসকদের দ্বারা কেউ যেন প্রতারিত না হয়– সেজন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন রাষ্ট্রপ্রধান।

এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজনের উদ্যোগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, হৃদরোগ বিষয়ে দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ ও মতবিনিময় সভা চিকিৎসকদের, বিশেষ করে তরুণ চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধকরণে সহায়ক হবে।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য ও নিরাপদ নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রতিটি নাগরিকের জন্য দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব

একটি সুস্থ জীবন নিশ্চিত করে কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করাই সরকারের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্য খাতে 'রূপকল্প–২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আপনাদের (চিকিৎসকদের) কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

বিচারকদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে খেয়াল রাখার আহ্বান

বিচারকদের যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় সেদিক কঠোরভাবে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। রাষ্ট্রপতি ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে দুইদিনব্যাপী 'একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবিধানিক আদালত: বাংলাদেশ ও ভারত থেকে শিক্ষা' শীর্ষক কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। আবার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে এবং ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয় সেদিকে কঠোরভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

বিচারকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, দেশ, জনগণ ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে ।

অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবনে কৃষিবিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবনে কৃষিবিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি 'কৃষিবিদ দিবস ২০২৪' উপলক্ষে ১২ই ফেব্রুয়ারি এক বাণীতে এ কথা বলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে দেশের সকল কৃষিবিদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষিই বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির প্রাণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এই চাহিদা পূরণে কৃষি বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবন, উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদনে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারে কৃষক ও খামারিসহ সকলকে সচেতন হতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাপনায় আধুনিক যন্ত্রপাতি তথা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং লাভজনক কৃষিতে রূপান্তরের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, কৃষিবিদরা তাদের জ্ঞান, মেধা ও শ্রম দিয়ে 'রূপকল্প–২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে কার্যকর অবদান রাখবেন। রাষ্ট্রপতি 'কৃষিবিদ দিবস ২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, এটা হচ্ছে পুলিশের মূলমন্ত্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বলব, আপনারা দেশের মানুষের সেবা করেন। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, এটা হচ্ছে পুলিশের মূলমন্ত্র। কাজেই পুলিশ বাহিনী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করবে– এটাই সব সময় আমাদের কাম্য। ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে ছয় দিনব্যাপী 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪'-এর উদ্বোধনকালে দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। এবারের পুলিশ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য– 'স্মার্ট পুলিশ স্মার্ট দেশ, শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে দেশের মানুষ পুলিশের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে। কাজেই আপনারা আন্তরিকতার সাথে মানুষের সেবা করবেন, সেটাই আমরা চাই। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। আর এই ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করতে হলে দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা একান্তভাবে অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের মানুষ যখনই কোনো বিপদে পড়ে, তখনই আশ্রয় খোঁজে পুলিশের কাছে। কাজেই পুলিশ জনগণের বন্ধু, এটা সব সময় চলে আসছে এবং এটাকেই প্রতিষ্ঠা করা একান্তভাবে দরকার। সে কারণেই আমি মনে করি, আমাদের পুলিশ বাহিনী তাদের সততা, পেশাদারি, নিষ্ঠা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, ত্যাগ, বীরত্ব, দেশপ্রেম ও মানবীয় মূল্যবোধ নিয়েই জনগণের সেবা করবেন। পুলিশ বাহিনীকে আমরা সেভাবেই গড়ে তুলছি।

এবারের পুলিশ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী সাহসী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৫ পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল (বিপিএম-বীরত্ব) ও ৬০ জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম-বীরত্ব) প্রদান করেন। এছাড়া ৯৫ জন পুলিশ সদস্য বিপিএম সেবা পদক ও ২১০ জন পিপিএম সেবা পদক পেয়েছেন।

মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিতে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান । তিনি বলেন, মাদক থেকে দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। আমাদের সমাজ এর থেকে মুক্তি লাভ করুক। আমরা চাই যে জনপ্রতিনিধিরা জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ যত্নবান হবেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, তাদেরই কিন্তু জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। জনগণের প্রতিনিধিদের জন্য সব থেকে বড়ো কথা হলো জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা। সেটা যিনি করতে পারেন, তার কোনো অসুবিধা হয় না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন– পিআইডি

আর সেটা যে করতে না পারেন, তাকে তো ব্যর্থ হতে হয়, ফেল করতে হয়, এটাই তো বাস্তবতা। সেটা মাথায় রেখেই নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার জনগণের প্রতি তাদের জনপ্রতিনিধিদের লক্ষ রাখার আহ্বান জানান তিনি।

দেশকে উন্নয়নের পথে নিতে পারে স্বাধীন বিচার বিভাগ ও শক্তিশালী সংসদ

স্বাধীন বিচার বিভাগ, শক্তিশালী সংসদ ও প্রশাসন একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পারে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জনগণের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তাঁর সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষমতা গ্রহণের পর আমরা বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করে সম্পূর্ণ স্বাধীন করেছি, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবিধানিক আদালত: বাংলাদেশ ও ভারত থেকে শিক্ষা' শীর্ষক দুই দিনের সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উচ্চ আদালতের রায়ে সামরিক শাসন ও সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখলকে অবৈধ হিসেবে রায় দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর যখন এই রায় এল, সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আবার গণতন্ত্রকে সুসংহত করি। আমাদের সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদ– যেখানে বলা আছে যে 'এই প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ', সেখানে আরেকটি অনুচ্ছেদ আমরা যুক্ত করে উচ্চ আদালতের রায় অনুসারেই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী যে অপরাধী এবং সেটা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সেটা আমরা সংযুক্ত করি। এর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের চেতনায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে

বাংলাদেশ বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মহান একুশ যে আদর্শের শিক্ষা দিয়েছিল, সেই আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলেই মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা আদর্শ নিয়ে না চললে কোনো দেশের উন্নতি করা যায় না। আর এই আদর্শ আমাদের শিখিয়েছে একুশ। একুশ আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করা। একুশ আমাদের শিখিয়েছে মাথা উঁচু করে চলা এবং আদর্শ নিয়ে চলা। ভাষা আন্দোলন থেকে যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, তার মাধ্যমেই কিন্তু আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে আমাদের অর্থবহ করতে হবে। এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক এলাকা থেকে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' আইন প্রণয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যে সামুদ্রিক এলাকাগুলো অর্জন করেছি, সেখান থেকে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, ব্লু ইকোনমির ঘোষণা বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমাদের বিশাল সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক থাকব এবং আমাদের পররাষ্ট্রনীতি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' অনুসরণ করে সমুদ্রপথে ব্যাবসা ও বাণিজ্য চালিয়ে যাব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ২০১২ ও ২০১৪ সালে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি করেছি। 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এই ক্রমধারা বজায় থাকবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

গণমাধ্যমকে শক্তিশালী ও মজবুত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত সরকার

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, গণমাধ্যমকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সরকার প্রস্তুত। ১লা মার্চ চাঁদপুর প্রেসক্লাব চত্বরে প্রেসক্লাবের ২০২৪ সালের কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তব্য প্রদানকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম এখন শিল্প। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণতা পাবে না। এরকম বাস্তবতায় সরকার গণমাধ্যমকে পূর্ণাঙ্গভাবে সকল সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছে। সে ক্ষেত্রে সরকার সাংবাদিকদের কাছ থেকে একই ধরনের সহযোগিতা চায়। তিনি বলেন, পেশাদার সাংবাদিকদের মধ্যে সাংবাদিকতায় শৃঙ্খলা আনার একটি দাবি রয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সাংবাদিকতাকে এভাবে উন্মুক্ত ও অবারিত করেছেন, এমনভাবে স্বাধীনতা দিয়েছেন সেটা নিয়ন্ত্রণের কথা এখন সাংবাদিকরাই বলছেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এই শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করে। গণমাধ্যম সেক্টরে সরকার যা কিছু করবে তা এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে করবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক আছে। বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভবান করা না গেলে গণমাধ্যম অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। এজন্য কোনো গণমাধ্যমকে আমরা যদি সরকারি বিজ্ঞাপন বা ক্রোড়পত্রের ওপর নির্ভরশীল করতে চাই, তাহলে সেটি দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকা মুশকিল হবে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে আরও উদ্ভাবনী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, সৃজনশীলতা আনতে হবে কীভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছানো যায়, কীভাবে সফল হওয়া যায়।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা পেশায় জবাবদিহিতা আনতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৪ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডের তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষকী ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার মূল কাজ কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে জবাবদিহিতায় আনা। সমাজের দর্পণ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি, ভালো-মন্দ সবকিছু তুলে ধরা। কিন্তু অন্যান্য পেশার মতো এ পেশার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নামে অপসংবাদিকতা, পেশাদারিত্বের জায়গায় অপেশাদারি মনোভাব দেখা যায়। যারা সমাজের সর্বক্ষেত্রে সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনবেন, সে পেশায়ও কিছুটা জবাবদিহি থাকার প্রয়োজন আছে। সে জায়গায় প্রেস কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

তিনি আরও বলেন, যারা পেশাদারিত্বের সাথে দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা করে আসছেন তারাও চান এ পেশার মধ্যেও একটা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং এক ধরনের শৃঙ্খলা থাকুক। তিনি বলেন, সাংবাদিকতাকে অপব্যবহার করে কোনো গোষ্ঠী যাতে ষড়যন্ত্র করতে না পারে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। সেখানে প্রেস কাউন্সিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, প্রেস কাউন্সিল আইন আরও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। সরকারের উদ্দেশ্য গণমাধ্যমকে আরও স্বচ্ছ, সুন্দর এবং শক্তিশালী করা। গণমাধ্যমের স্থান যাতে সংকুচিত না হয়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ যাতে নিশ্চিত হয়, গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যাতে আরও উন্মুক্ত হয় সেটিই সরকারের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকবান্ধব এবং গণমাধ্যমবান্ধব। গত ১৫ বছরে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ সময়ে উদার-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে কাজ করবে

বিশ্বব্যাপী অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রতিরোধে বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। ২৪শে ফেব্রুয়ারি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর সদস্য দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীদের ইসলামিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের পূর্বে তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ফাহরেতিন আলতুনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা জানান ।

বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে অপতথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রচার লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এর নেতিবাচক শিকার। অপতথ্য ও ভ্রান্ত তথ্য প্রতিরোধ তাই এখন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও তুরস্ক দুদেশের মধ্যে যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ অপরাপর সহযোগিতার বিষয়ে দুই দেশ একসাথে কাজ করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপারে বাংলাদেশে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ফাহরেতিন আলতুন।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে সাংবাদিকের জন্য ২ কোটি ৩ লাখ টাকা অনুমোদন

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২৬৩ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে বিতরণের জন্য ২ কোটি ৩ লাখ টাকা অনুমোদন দিয়েছে সরকার। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে এ কল্যাণ অনুদান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এ সংক্রান্ত অনুমোদনের নথিতে স্বাক্ষর করেন। শিগগিরই সাংবাদিকদের এ কল্যাণ অনুদানের চেক বিতরণ করা হবে। এর আগে চলতি অর্থবছরে প্রথম পর্যায়ে ২৩৬ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে ১ কোটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, গণমাধ্যমবান্ধব ও সাংবাদিকবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কল্যাণে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে দুস্থ, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের এবং মৃত সাংবাদিকদের পরিবারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা এবং কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ট্রাস্ট থেকে ৩ হাজার ৯৩২ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে ৩৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

নৌপথে ৫৯ বছর পর বাণিজ্য শুরু

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে রাজশাহী থেকে নৌপথে ভারতে পণ্য পারাপার করা হতো। ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার ময়া এলাকা থেকে গোদাগাড়ী উপজেলার সুলতানগঞ্জ পর্যন্ত পণ্য আনা-নেওয়া হতো। বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হতো পাট ও মাছ। ভারত থেকে আসত বিভিন্ন পণ্য। ৫৯ বছর পর আবারও এই নৌপথে শুরু হয়েছে বাণিজ্য। ১২ই ফেব্রুয়ারি এর উদ্বোধন হয়। জানা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে এই পথে ভারত থেকে সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল, পাথর, মার্বেল, খনিজ বালু ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশে আসবে। বাংলাদেশ থেকে বস্ত্র, মাছ, পাট ও পাটজাত পণ্য ছাড়াও বিভিন্ন কৃষিপণ্য ভারতে যাবে।

সুলতানগঞ্জ থেকে ময়া নৌ-ঘাটের দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার। সুলতানগঞ্জ নৌ-ঘাট রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়ক থেকে এক কিলোমিটার ভেতরে পদ্মা মহানন্দার মোহনায় অবস্থিত। সারা বছর সুলতানগঞ্জ পয়েন্টে পদ্মায় পানি থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ময়া নৌ-ঘাটটি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমা শহরের কাছে ভারতীয় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সুলতানগঞ্জ-ময়া পথে নৌ-বাণিজ্য শুরু হলে পণ্য ভারত থেকে পরিবহণে সময় ও খরচ কম হবে। এতে উপকৃত হবেন দুই দেশের ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সুলতানগঞ্জ-ময়া ও গোদাগাড়ী-ভারতের লালগোলা নৌ-ঘাটের মধ্যে নৌপথে বাণিজ্য কার্যক্রম চালু ছিল। যুদ্ধের সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এত বছর পর নৌ প্রটোকল চুক্তির আওতায় আবার চালু হয়েছে।

১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে

হবিগঞ্জের রশীদপুর গ্যাসফিল্ডে নতুন কূপের গ্যাস সঞ্চালনের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। হবিগঞ্জের রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের দুটি কূপ থেকে আরও ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। এই গ্যাসক্ষেত্রের ৯ নম্বর কূপের একটি পাইপ লাইন ও ২ নম্বর কূপের সংস্কার করে এই গ্যাস মিলেছে। এখন গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬ মিলিয়ন ঘনফুট। একটি কূপ থেকে আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, যা খুবই বিরল। রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে ১১টি কূপ রয়েছে, যার মধ্যে নয়টি কূপে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে সাতটি কূপ থেকে ৬৬.৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে।

১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত হয় রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড। এখানে প্রমাণিত মজুত ১০৬০ বিলিয়ন ঘনফুট, সম্ভাব্য রয়েছে ১৩৭৩ বিসিএফ, আরও সম্ভাবনাময় বিবেচনা করা হয় ৬৮০ বিসিএফ। উত্তোলন যোগ্য প্রমাণিত (১পি) ও সম্ভাব্য মিলে মজুত ধারণা করা হয় ২৪৩৩ বিসিএফ। ২০২২ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত গ্যাস ক্ষেত্রটি থেকে ৬৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে।

অবশিষ্ট মজুতের পরিমাণ রয়েছে ১৭৫৭ বিএসএফ।

প্রথম বর্জ্যপৃথকীকরণ প্ল্যান্ট

সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) প্লাস্টিক ও মিউনিসিপাল সলিড বর্জ্য টেকসই উপায়ে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি বর্জ্যপৃথ কীকরণ প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সিলেটের লালমাটিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডে এই প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। সিলেট সিটি করপোরেশন এবং লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এটাই দেশের প্রথম ও একমাত্র প্লাস্টিক বর্জ্যপৃথকীকরণ প্ল্যান্ট। এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অপচনশীল প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলাদা করা সম্ভব হবে। ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য শহরেও এই প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে।

এই প্ল্যান্টটি চালুর ফলে সিলেট নগরী প্লাস্টিক বর্জ্যের হাত থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করছে সিসিক। প্লাস্টিক বর্জ্য টেকসই ব্যবস্থাপনা বর্তমান সরকারের দীর্ঘ দিনের চ্যালেঞ্জ। পুরো পৃথিবীই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের টেকসই পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশও সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ হ্রাসে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের একার পক্ষে কঠিন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয় তাই প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র বলেন, সিলেটবাসীসহ সকল দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ আপনারাও সচেতন হন এবং প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার কমান। যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক পণ্য ফেলে পরিবেশের ক্ষতি করবেন না।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

আইটি ফ্রিল্যান্সারদের উদ্যোক্তায় পরিণত করতে হবে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে আইটি ফ্রিল্যান্সারদের যথাযথ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তায় পরিণত করতে হবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চট্টগ্রাম চেম্বার্স অ্যান্ড কমার্স আয়োজিত

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ চট্টগ্রামে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ৫ম চট্টগ্রাম আইটি ফেয়ার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

পঞ্চম আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রামের কোনো উদ্ভাবনী তরুণ-তরুণী যদি উদ্যোক্তা হতে চান, তাদের যত ধরনের সেবা লাগবে বর্তমান সরকার সব দিতে প্রস্তুত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামকে তিনটি উপহার ইতোমধ্যে দিয়েছেন। সেগুলো হলো– ১শো কোটি টাকা ব্যয়ে ১০তলা শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর সেন্টার, নির্মাণাধীন শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এবং নলেজ পার্ক তৈরি করার জন্য জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে। এ কাজগুলো সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম একটি সিলিকন সিটিতে রূপান্তরিত হবে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবক দেশ হিসেবেও বিশ্ব আমাদের চিনবে

অমর একুশে শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) তৈরি করা বাংলা টেক্সট টু স্পিচ, বাংলা স্পিচ টু টেক্সট ও বর্ণবাংলা ওসিআর অ্যাপস এবং পূর্ণ বাংলা ফন্ট উদ্বোধন করা হয়। সেইসঙ্গে বিটিসিএলের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট জিপন-এর 'সুলভ' ও 'ভাষা' নামের দুটি সাশ্রয়ী প্যাকেজ চালু করা হয়। এই প্যাকেজে গ্রাহককে বিনামূল্যে রাউটার দেবে সরকারি টেলিকম প্রতিষ্ঠান। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে নতুন এ প্রযুক্তি সেবাগুলো উদ্বোধন করেন ডাক, টেলিযোগাযাগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রত্যেকটা সেবা নিজস্ব উদ্ভাবক, গবেষকের মাধ্যমে তৈরি করতে চাই। যেমন আমরা বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহার করতে বাধা দেবো না, কিন্তু যেন আমাদের নিজস্ব একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থাকে, সেজন্য আমরা দেশি উদ্ভাবক, গবেষকদের উৎসাহিত করছি, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছি। অবশ্য আমরা গুগল জি বোর্ড, গুগল ক্লাউড ব্যবহার করব, পাশাপাশি উচ্চারণ, কথা, বর্ণমালা, পূর্ণ, অনুভব, ধ্বনি, গুরুসহ আমাদের নিজস্ব যত ধরনের প্রযুক্তি সেবা রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করব। আমাদের ৪০টি সফটওয়্যার, ১৬টি কম্পনেন্ট (bangla.gov.bd) https://bangla.gov.bd/-এ সমন্বয় করেছি। সবগুলো একসঙ্গে এখানে সংরক্ষণ করেছি।

এগুলোর কপিরাইট, মেধাস্বত্ব বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট থাকবে, যা ভবিষ্যতে নতুন ধরনের সার্চ ইঞ্জিনের জন্য ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করবে।

দেশের প্রথম কমার্শিয়াল টিয়ার ফোর ডেটা সেন্টারের যাত্রা শুরু

যাত্রা শুরু করেছে দেশের প্রথম সার্টিফায়েড টিয়ার ফোর কমার্শিয়াল কো-লোকেশন ডেটা সেন্টার 'সাইফার।' রবি আজিয়াটা লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ্যাকজেনটেক আনুষ্ঠানিকভাবে সাইফারের যাত্রা শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে সাইফার। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা যশোরে উদ্বোধন হলো দেশের প্রথম সার্টিফায়েড টিয়ার ফোর কমার্শিয়াল কো-লোকেশন ডেটা সেন্টার সাইফার। অ্যাকজেনটেক ও রবির এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা গর্বের সঙ্গে বহির্বিশ্বকে বলতে পারি যে আমাদের দেশেও বিশ্বমানের ডেটা সেন্টার রয়েছে।

যশোরে ১৬ হাজার ৫০০ বর্গফুটের সাইফার-এর ভবনটিতে আছে পাওয়ার ব্যাকআপ, অ্যাডভান্সড কুলিং মেশিনারিসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কাজ করে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে সাইফার। ডিজিটাল অবকাঠামোর মান নিরূপণে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সংস্থা আপটাইম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে সম্মানজনক টিয়ার ফোর সনদ অর্জন করেছে সাইফার। নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সব প্রযুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে সাইফারে। এছাড়া ৯৯ দশমিক ৯৯৫ শতাংশ আপটাইম বিশিষ্ট সাইফারে আছে বায়োমেট্রিক একসেস কন্ট্রোলের মতো মিলিটারি গ্রেড সিকিউরিটি। এছাড়া সাইবার হুমকিসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট ক্যাবল ব্যবস্থাই পারে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে

স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট ক্যাবল শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজন স্মার্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনা। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেডকে (বিসিএসএল) আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য রেখে অধিক লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি বিসিএসএল পরিদর্শন শেষে মতবিনিময়কালে এ নির্দেশনা দেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুলনায় বাণিজ্যিকভাবে বিসিএসএল প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরুর মাধ্যমে দেশে ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দেশে কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রযুক্তি বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর রোপণ করা বীজকে চারা গাছে রূপান্তরিত করেন। ২০০৮ সালের পর থেকে দেশ ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যাত্রা শুরু করে। তাই বর্তমান চ্যালেঞ্জ হলো দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সঙ্গে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ জিপন-এর বিশেষ সাশ্রয়ী প্যাকেজের আওতায় ৫ এমবিপিএস-এর বিদ্যমান মূল্য ৫০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩৯৯ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় ১০ এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউডথ ৮০০ টাকার বদলে এখন পাওয়া যাবে ৫০০ টাকায়। আর ৮০০ টাকায় পাওয়া যাবে ১৫ এমবিপিএস ইন্টারনেট সেবা যার মূল্য ছিল ১০৫০ টাকা। এছাড়াও ১২৫০ টাকার ২০ এমবিপিএস-এর দাম কমে হয়েছে ১০৫০ টাকা। ১৪৫০ টাকার ২৫ এমবিপিএসের মূল্য এখন ১৩০০ টাকা। পাশাপাশি ৩০, ৪০ ও ৫০ এমবিপিএস-এর ইন্টারনেট সেবার মূল্য কমে হয়েছে যথাক্রমে ১৫০০, ২০০০ এবং ২৪০০ টাকা।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

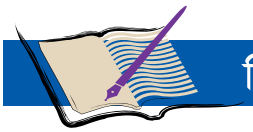

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের পরিকল্পনা নেই

জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী জানান, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনা নেই। তিনি বলেন, এই নতুন শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে আরও কীভাবে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান। ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু হচ্ছে, ওই শিক্ষাব্যবস্থায় মেধাবী একটি জাতি তৈরি হবে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থা মূলত নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত, যা আগামী প্রজন্মকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে সহায়ক হবে। এর পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, বিশ্বায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং মধ্য আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরের জন্যও তৈরি হবে আগামী প্রজন্ম।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অতীতের মুখস্থনির্ভর ও সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বের হয়ে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যুগের চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীরা মেধাশূন্য নয়, নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা আরও দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠবে।

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা নেই, বিষয়টি তেমন নয়। আগের মুখস্থনির্ভর ও সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যা প্রচলিত পরীক্ষার ধারণা থেকে ভিন্ন। এর ফলে আগের মতো মুখস্থনির্ভর পরীক্ষা না থাকার কারণে অনেকেই নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেই বলে অভিযোগ করছেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, নতুন শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে একটি আধুনিক কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এখানে লিখিত মূল্যায়নের পাশাপাশি সমস্যা সমাধান, একক কাজ, দলীয় কাজের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। উপস্থাপন ও যোগাযোগ সক্ষমতা, সহযোগিতা, নেতৃত্ব, অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণসহ আরও নানান উপায়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা শিক্ষামন্ত্রীর

দেশের সব পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। ৫ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে শিক্ষামন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন এমন একটি সংগঠন, যা বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের সুনাগরিক, ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি শিক্ষাশ্রয়ী প্ল্যাটফরম।

সব মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডস কার্যক্রম আরও বাড়ানোর জন্য তিনি পরামর্শ দেন। এ সময় গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দনপত্র ও স্কার্ফ পরিয়ে দেন।

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা হবে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২৩ সালের মতো সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২৩ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার মতো সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ১৮ই ফেব্রুয়ারি আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার জানান, আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এইচএসসি পরীক্ষাও হবে পুনর্বিন্যাসকৃত (সংক্ষিপ্ত) পাঠ্যসূচিতে। তবে পরীক্ষা হবে পূর্ণ নম্বরে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব নিলেন সায়মা ওয়াজেদ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অফিসের (ডব্লিউএইচওএসইএআরও) আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বৈশ্বিক অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। ১লা ফেব্রুয়ারি তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আগামী পাঁচ বছরের

জন্য তিনি এ দায়িত্ব পেলেন। সায়মা ওয়াজেদই প্রথম বাংলাদেশি যিনি ১৯৪৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক বিভাগের অংশ হিসেবে সৃষ্ট এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে অটিজমের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। ২০১৯ সাল থেকে তিনি মানসিক স্বাস্থ্য এবং অটিজম বিষয়ে ডব্লিউএইচও-এর মহাপরিচালকের একজন উপদেষ্টা এবং ২০১৪ সাল থেকে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ডব্লিউএইচও-এর বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য ছিলেন।

এর আগে সায়মা ওয়াজেদকে ২০১৭ সালে ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অটিজম বিষয়ক শুভেচ্ছা দূত মনোনীত করা হয়েছিল। তিনি একই বছর অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার সম্পর্কিত ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কৌশলের সহ-লেখক ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল হেলথ প্রোগ্রাম চ্যাথাম হাউজের অ্যাসোসিয়েট ফেলো, বাংলাদেশের অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন এবং সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন। সায়মা ওয়াজেদ ২০১৪ সালে ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক 'এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ' পুরস্কার এবং ২০১৬ সালে ডক্টর ইব্রাহিম মেমোরিয়াল কাউন্সিল, বাংলাদেশ কর্তৃক অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার নিয়ে কাজ করার জন্য ইব্রাহিম মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। ২০১৭ সালে সায়মা ওয়াজেদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অটিজম নিয়ে কাজ করার জন্য মার্কিন সংস্থা শেমা কোলাইনু থেকে আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার পান। ২০১৯ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম কর্তৃক ইনোভেটিভ উইমেন লিডারস ইন গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ পুরস্কারে ভূষিত হন। সায়মা ওয়াজেদ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ব্যারি ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং পরে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে স্নাতকোত্তর করেন।

উল্লেখ্য, গত ১লা জানুয়ারি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের জন্য ডব্লিউএইচও আঞ্চলিক কমিটির ৭৬তম অধিবেশনে সদস্য দেশগুলো সায়মা ওয়াজেদকে এই পদে মনোনীত করার পক্ষে ভোট দেয়। পরে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ২২ থেকে ২৭শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ডব্লিউএইচও নির্বাহী বোর্ডের ১৫৪তম অধিবেশনে তার মনোনয়ন অনুমোদন করা হয়।

শপথ নিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা

দ্বাদশ সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নবনির্বাচিত ৫০ জন সদস্য শপথ নিয়েছেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। এ সময় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। স্পিকার প্রথমে আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত আসনের ৪৮ জন সংসদ সদস্যকে শপথ পড়ান। পরে শপথ নেন বিরোধী দলের দুই জন সংসদ সদস্য।

দ্বাদশ সংসদে আওয়ামী লীগের ২২৪ জন, জাতীয় পার্টির ১১ জন, স্বতন্ত্র ৬২ জন এমপি রয়েছেন। এছাড়া জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টির এমপি রয়েছেন একজন করে। এর সঙ্গে সংরক্ষিত আসনে আওয়ামী লীগের আরও ৪৮ জন ও জাতীয় পার্টির ২ জন যোগ হলো। এর আগে নারী আসনের এসব সংসদ সদস্যের নাম, ঠিকানাসহ গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

আসন্ন ঈদে ট্রেন যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ

রেলপথ মন্ত্রী মো. জিল্লুল হাকিম বলেন, আসন্ন ঈদে ট্রেন যাত্রা নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করা হবে। ঈদ যাত্রায় যাত্রীদের ভোগান্তির মাত্রা যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করা হবে। ১লা মার্চ রাজবাড়ী ট্রেন স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন রেলমন্ত্রী।

রেলমন্ত্রী বলেন, এবারের ট্রেনের ঈদ যাত্রা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হবে। সকল ট্রেন যাত্রীদের ঈদে ঘরে ফেরার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। ঈদ যাত্রায় যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেন ও বগির সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে টিকিটের পাশাপাশি আমরা স্টেশনগুলোতেও টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করবো। ঈদকে সামনে রেখে সব সুযোগ সুবিধাই রাখা হবে ট্রেনে।

রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিম বলেন, জনবল বাড়ানো হবে, ড্রাইভার ও স্টেশন মাস্টার নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। জনবল নিয়োগ দেওয়ার পর বন্ধ হওয়া এবং নতুন স্টেশনগুলো চালু করা হবে।

বাংলাদেশের সাথে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী সুইজারল্যান্ড

বাংলাদেশের সাথে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি (Reto Renggli)। ২২শে ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সাথে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত এই আগ্রহের কথা জানান।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী সুইজারল্যান্ডের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমরা আশা করছি আগামী দুই

মাসের মধ্যে বাংলাদেশ এবং সুইজারল্যান্ডের মাঝে এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হবে। এরপর আমরা দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করব। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অবস্থান আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল রুটের মধ্যে হওয়ায় আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে একটি অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাবে রূপান্তর করার জন্য কাজ করছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল, কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ ও নতুন টার্মিনাল নির্মাণসহ দেশের সকল বিমানবন্দরের এভিয়েশন অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত বলেন, এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশ টিমের সাথে কাজ করাটা ছিল আমাদের জন্য আনন্দের। বাংলাদেশ টিম নেগোসিয়েশনে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছে। তাদের দক্ষতা ও সহযোগিতার জন্য সুইজারল্যান্ডের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ জানিয়েছে।

রেতো রেংগলি আরও বলেন, বাংলাদেশে গত ১৫ বছরে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা আশা করছি বাংলাদেশকে এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের যে কাজ চলছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন হবে। আমরা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের জন্য সুইজারল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের সাথে কথা বলবো। বিনিয়োগের জন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন যাতে বাংলাদেশ সফর করে সেই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করব।

প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

৫১৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি

চলতি বছরের সদ্য সমাপ্ত ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ১২ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। এ মাসে রপ্তানি হয়েছে ৫১৮ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ৫৭২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল আর প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ। ৫ই মার্চ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) পণ্য রপ্তানির এ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারিতে তৈরি পোশাক ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত

পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে অন্য বড়ো খাতসমূহ যেমন হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল ও প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি কমেছে। ফেব্রুয়ারিতে মোট রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫২৩ কোটি মার্কিন ডলারের। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) তিন হাজার ৮৪৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ আয় তার আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ বেশি। আলোচ্য সময়ে পোশাক রপ্তানিতে ৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া প্লাস্টিকে ১৬ দশমিক ৮২ শতাংশ, জুতায় ৮ দশমিক ৭ শতাংশ ও কাঁচা পণ্যে ৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

খাদ্য অপচয় কমাতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী হবে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ বলেন, বাংলাদেশে ফসল সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ ফসল ও খাদ্য নষ্ট এবং অপচয় হয়। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নষ্ট ও অপচয়ের পরিমাণ কমাতে পারলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৭তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনে 'খাদ্য ও পানি সংরক্ষণ এবং খাদ্য অপচয় রোধ' শীর্ষক সেশনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে বর্তমান সরকারের এখন অগ্রাধিকার হলো ফসলের সংগ্রহত্তোর নষ্ট ও অপচয়ের বিশাল পরিমাণ কমিয়ে আনা। সে লক্ষ্যে সরকার ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে এবং বহুমুখী হিমাগার নির্মাণ, বহু ফসলের সমন্বিত সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও শাকসবজি পরিবহণে

রেফ্রিজারেটেড ভেহিকল প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে; তারপরও এসব খাতে বেসরকারি ও বিদেশি বিশাল বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমরা এখন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বিদেশি বিনিয়োগ আনার বিষয়ে এফএও সহযোগিতা করতে পারে। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. মাহমুদুর রহমান এবং এফএও'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি উপস্থিত ছিলেন।

পাটবান্ধব নীতির কল্যাণে বিগত ১০ বছরে পাটের উৎপাদন বেড়েছে ৩৩ লাখ বেল

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের পাটবান্ধব নীতির কল্যাণে বিগত ১০ বছরে পাটের উৎপাদন বেড়েছে ৩৩ লাখ বেল। তিনি বলেন, ২০১৫ সালে যেখানে ৫১ লাখ বেল পাট উৎপাদন হতো, সেখানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশে পাট উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৮৪ লাখ বেল। এর মধ্যে প্রায় ৪৩ লাখ বেল পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা আয় হয়েছে। ১২ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'পাট গবেষণায় জিনোম সেন্টারের সাফল্য ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য ২০০৯ সালে পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং-এর কার্যক্রম শুরু করান এবং জিনোম সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ২০১০ সালে বিশ্বে সর্বপ্রথম পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন হয়। জীবন রহস্য উন্মোচনের ফলে দেশে চাষোপযোগী উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে। আর দেশের মাটিও পাট চাষের জন্য খুবই উপযোগী। কাজেই পাটের উৎপাদন বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে।

১৫ বছরে ডালের উৎপাদন বেড়েছে ৪ গুণ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ জানিয়েছেন, গত ১৫ বছরে দেশে ডালের উৎপাদন বেড়েছে ৪ গুণের বেশি। তিনি বলেন, ২০০৮-২০০৯ সালে যেখানে মাত্র ২ লাখ টনের মতো ডাল উৎপাদন হতো সেখানে ২০২২-২০২৩ সালে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৯ লাখ টনের মতো। কিন্তু তা দেশের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ। সেজন্য এখন লক্ষ্য ডালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। আন্তর্জাতিক ডাল দিবস উপলক্ষে ১০ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার। অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। বারির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ কে এম মাহবুবুল আলম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ডাল ফসলের গবেষণা ও উৎপাদনে অসাধারণ অবদানের জন্য তিন বিজ্ঞানীকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিটি ইউনিয়নে সাইক্লোন শেল্টার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান বলেন, ঝড়-ঝঞ্ঝায় মানুষ যাতে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে, এজন্য আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আগামী বছর প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি করে সাইক্লোন শেল্টার (ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র) নির্মাণ করা হবে। বিদেশি অর্থায়নে আন্তর্জাতিক মানের সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের জন্য একটি সংস্থার সঙ্গে কথা হয়েছে।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর সোনারচর, জাহাজামারা ও চরহেয়া সমুদ্রসৈকতে একটি করে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ হবে বলে জানান। প্রতিমন্ত্রী ২১শে ফেব্রুয়ারি নিজ নির্বাচনি এলাকা পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান বলেন, দুর্যোগকালীন আমাদের দেশের সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে বিদ্যুৎ থাকে না। তাই মন্ত্রণালয়ের নির্মিত সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জন্য সোলার সিস্টেমের (সৌর সোলার) আওতায় নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উপজেলার বাহেরচর থেকে নেতা বাজার হয়ে দাসবাড়ি সড়ক এবং গঙ্গিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সামুদবাদ বটতলা সড়ক নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রতিমন্ত্রী।

পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট তৈরিতে সরকারি প্রণোদনা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট তৈরিতে সরকার উদ্যোক্তাদের

প্রণোদনা দেবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। ইটভাটা মালিকরা চাইলে প্যাকেজগুলো গ্রহণ করতে পারেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি ফেনী সার্কিট হাউসে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় পরিবেশমন্ত্রী প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধসহ পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, সব বায়ু দূষণকারী ও কৃষিজমির মাটি ক্ষয়কারী ইটভাটা বন্ধ করে আধুনিক পদ্ধতির ব্লক ইটের ব্যবহার পুরোপুরি চালু করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ইটভাটাগুলো যাতে আর চালু হতে না পারে, সেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পৌরসভাগুলোর বর্জ্য রিসাইকেল করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান করে দেওয়া হবে। তিনি এ সময় জবরদখল করা বনভূমি উদ্ধার এবং নগর ও উপকূলীয় বনায়নের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

একুশে পদক প্রদান

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিতে ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিক এবার একুশে পদক পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মনোনীত ও তাদের প্রতিনিধিদের হাতে পদক তুলে দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালের একুশে পদকের জন্য মনোনীতদের নাম ঘোষণা করে। তাদের মধ্যে ছয়জনই মরণোত্তর এ সম্মাননা পেলেন।

ভাষা আন্দোলনে এবার একুশে পদক পেয়েছেন দুজন: মৌলভী আশরাফুদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর) এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর)। শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংগীতে জালাল উদ্দীন খাঁ (মরণোত্তর), মরমী শিল্পী বিদিত লাল দাশ (মরণোত্তর) আর কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর)।

স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দ সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ এবং গায়ক শুভ্র দেব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পদক নেন। নৃত্যকলায় শিবলী মোহাম্মদ, অভিনয়ে ডলি জহুর ও এম এ আলমগীর, আবৃত্তিতে খান মো. মুস্তাফা ওয়ালীদ (শিমুল মুস্তাফা) ও রূপা চক্রবর্তীও পদক নেন প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে।

চিত্রকলায় শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিংয়ে কাওসার চৌধুরী এবং সমাজসেবায় মো. জিয়াউল হক ও আলহাজ রফিক আহামদকে একুশে পদকে ভূষিত করেন সরকারপ্রধান। এছাড়া ভাষা ও সাহিত্যে মুহাম্মদ সামাদ, লুৎফর রহমান রিটন, মিনার মনসুর এবং শিক্ষায়

প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একুশে পদক গ্রহণ করেন। ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক পান রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (মরণোত্তর)।

উল্লেখ্য স্বাধীনতা পুরস্কারের পর রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদক'। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ১৯৭৬ সাল থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এ পদক দিয়ে আসছে সরকার। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, এককালীন চার লাখ টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়।

ইরানের জাতীয় পুরস্কার পেল জয়ার *ফেরেশতে*

ইরানের জাতীয় পুরস্কার জিতেছে জয়া আহসান অভিনীত বাংলাদেশ ও ইরানের যৌথ-প্রযোজনার সিনেমা *ফেরেশতে*। ইরানের ৪২তম ফজর চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হয় *ফেরেশতে*। এই উৎসবেই ইরানের জাতীয় পুরস্কার জিতে নেয় সিনেমাটি।

প্রতিবছর ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে ইরান সরকার সেসব সিনেমাকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করে যেগুলোতে মানবাধিকার, শিক্ষা, পরিবেশ, দাতব্য কাজ ইত্যাদি বিভাগে দেশটির জাতীয় ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। 'খয়র-ই-মান্দেগার' নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। এই সংস্থাটি ইরানের সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান, দাতা, এনজিও-এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রতিষ্ঠানটি ইরানে ইউনিসেফের মতো সক্রিয়। উৎসবে *ফেরেশতে* সিনেমার প্রধান দুই চরিত্র জয়া আহসান এবং সুমন ফারুককেও পুরস্কৃত করা হয়। দুজনকেই 'খয়র-ই-মান্দেগার' স্মারক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

ইরানের উৎসবে পুরস্কৃত ফারিন

অভিনয়ে দেশের দর্শক-সমালোচকদের মন বরাবরই জিতে চলেছেন তাসনিয়া ফারিন। তবে এবার তার অভিনয়ের স্বীকৃতি মিললো ইরান থেকেও। চলচ্চিত্র নিয়ে দেশটির বৃহত্তম আয়োজন 'ফজর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ পুরস্কার পেয়েছেন ফারিন।

ফাতিমা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তাকে 'ইস্টার্ন ভিস্তা' বিভাগে ক্রিস্টাল সিমোর্গ পুরস্কার দেওয়া হয়। ৪২তম ফজর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ১১ই ফেব্রুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারি ইস্টার্ন ভিস্তা (এশিয়ান-ইসলামিক দেশগুলোর জন্য নির্ধারিত) বিভাগে প্রদর্শিত হয় ফারিন অভিনীত *ফাতিমা* ছবিটি। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্পে নির্মিত এই ছবিতে ফারিনের সঙ্গে আরও আছেন পান্থ কানাই, ইয়াশ রোহান, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিক আনাম খান, শতাব্দী ওয়াদুদ, শাহেদ আলী প্রমুখ।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

রমজানে সাশ্রয়ী মূল্যে মাছ, মাংস ও ডিম বিক্রি করবে সরকার

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ১০ই মার্চ থেকে ঢাকার ৩০ স্থানে ভ্রাম্যমাণ ট্রাক সেলের মাধ্যমে গরুর মাংস ৬০০ টাকায়, খাসির মাংস ৯০০ টাকা ও সলিড ব্রয়লার ২৮০ টাকায় বিক্রি করা হবে বলে জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান। ৪ঠা মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ডিম বিক্রি হবে প্রতিটি ১০ টাকা ৫০ পয়সায়। কাজেই এটাই হলো আমাদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। ঈদের আগের দিন পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে। তিনি

আরও বলেন, ঢাকায় ৩০ জায়গায় এটা করা হবে। পর্যায়ক্রমে সামর্থ্য অনুসারে এ ব্যাপারগুলো আরও বেশি জায়গায় প্রসারিত করার চেষ্টা করব। রমজান মাসে আমরা কঠোরভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করব। এবার ডিসিরা তাদের সব সামর্থ্য নিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে একমত হয়েছেন।

রমজানে ৫০ লাখ পরিবারকে চাল দিবে সরকার

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় পবিত্র রমজান উপলক্ষে ১০ই মার্চের মধ্যে ৫০ লাখ পরিবারকে দেড় লাখ টন চাল বিতরণ করা হবে বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। ৪ঠা মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে চলা জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন শেষে তিনি এই কথা জানান। তিনি বলেন, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১লা মার্চ থেকেই ডিলারদের চাল ওঠাতে বলেছি। ১লা থেকে ২০শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের একটি সিদ্ধান্ত ছিল। সেটা কমিয়ে ১০ই মার্চের মধ্যে ৫০ লাখ পরিবারকে দেড় লাখ টন খাদ্য বিতরণ শেষ করা হবে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দেড় লাখ টন চাল বাজারে ১৫ টাকা দরে বিক্রি হলে বাজারে স্বস্তি ফিরে আসবে বলে মনে করি। কারণ ৫০ লাখ পরিবারকে তো আর বাজার থেকে চাল কিনতে হবে না।

বস্তায় চালের দাম ও জাত লেখা থাকার সিদ্ধান্ত কার্যকর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ১৪ই এপ্রিল বা পহেলা বৈশাখ থেকে কার্যকর করব। তখন বাজারে বোরোর নতুন চাল আসবে। যেসব চাল এখন বাজারে বস্তাবন্দি আছে এবং সিল মারা আছে, সেগুলো এখন আর কেউ প্যাকেট চেঞ্জ করবে না। কাজেই নতুন বছরে বোরো চাল উঠবে, তখন থেকে এটা কার্যকর হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ডিসি ও মিল মালিকদের সঙ্গে মিটিং শুরু হয়েছে। ধান ও চালের জাতের যে নমুনা, সেটা তাদেরও সরবরাহ করা হচ্ছে। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সে জাতগুলো দিয়েছে। আউশ, আমন ও বোরোতে কোন কোন জাত, কোনটা মোটা, মাঝারি ও সরু সেই জাত দিয়েছে, সেটা নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করছি। তিনি বলেন, মজুতবিরোধী অভিযান অনেকাংশেই সফল হয়েছে। ডিসিদের নির্দেশনা দিয়েছি যাতে বস্তার গায়ে জাতের নাম লেখা নিয়ে যে পরিবর্তন এসেছে, সেটা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিপিএলে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন বরিশাল

বিপিএলে ৩ বার ফাইনাল খেলেছে ফরচুন বরিশাল। সর্বশেষে ২০২২ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষেই ফাইনালে হারে তারা। এবার সেই কুমিল্লাকে হারিয়েই প্রথমবার বিপিএলের শিরোপা জয়ের স্বাদ পেল বরিশাল। ১লা মার্চ মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলের ফাইনালে কুমিল্লাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে

চ্যাম্পিয়ন হয় তামিম ইকবালের দল। শুধু বরিশাল নয়, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মেহেদী হাসান মিরাজও এবারই প্রথম বিপিএলে শিরোপা জয়ের স্বাদ পেলেন।

এদিন আগে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৫৪ রান করে কুমিল্লা। জবাবে অধিনায়ক তামিম ইকবালের ২৬ বলে ৩৯ এবং কাইল মায়ার্সের ৩০ বলে ৪৬ রানের দারুণ নৈপুণ্যে ১ ওভার বাকি থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বরিশাল।

সেরা বোলিংয়ের পুরস্কার জিতলেন মারুফা

আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান নারী ক্রিকেটারের পুরস্কারে মনোনয়ন পেলেও শেষ পর্যন্ত সেরার স্বীকৃতি পাননি মারুফা আক্তার। এক মাস না যেতেই ২০শে ফেব্রুয়ারি ক্রিকেটের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর বার্ষিক অ্যাওয়ার্ডে ২০২৩ সালের সেরা নারী ওয়ানডে বোলিং পারফরম্যান্সের পুরস্কার জিতেছেন মারুফা। গত বছর জুলাইয়ে মিরপুরে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ নারী দলের প্রথম ওয়ানডে জয়ে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল মারুফার।

এশিয়া কাপ আরচারিতে চার পদক জয়

ইরাকের বাগদাদে চলমান এশিয়া কাপ স্টেজ-১ (ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং) আর্চারির দুটি ইভেন্টের ফাইনালে উঠে বাংলাদেশ। ফাইনালে দুটি করে রুপা ও ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ। সবই দলীয় পদক। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ইরাকের বাগদাদে অনুষ্ঠিত রিকার্ভ পুরুষ দলগত ও মিশ্র বিভাগে ভারতের কাছে হেরে রুপা পায় বাংলাদেশ। রিকার্ভ নারী দলগত ইভেন্টের ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচে বাংলাদেশ ৬-০ সেটে ইরাককে এবং কম্পাউন্ড মিশ্র বিভাগের ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচে বাংলাদেশের তপু রায় ও মেঘলা রানী ১৪৮-১৪৫ স্কোরে স্বাগতিকদের হারিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক জুডোতে প্রথম স্বর্ণজয়

আন্তর্জাতিক জুডোতে এই প্রথম স্বর্ণপদক জিতল বাংলাদেশ। ১০-১৪ই ফেব্রুয়ারি ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত জিতা-কিওই আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতায় জোড়া স্বর্ণ জিতেছেন জুডোকা দিপু দেওয়ান। তিনি ব্যক্তিগত +৬৬ কেজিতে এবং দলগত বিভাগে এই দুটি স্বর্ণপদক জেতেন। এছাড়া -৬৬ কেজিতে রুপাও জেতেন দিপু। দেশের জুডোর ইতিহাসে নাম লেখালো দিপু। সে প্রথম লাল-সবুজের জুডোকা, যে বিদেশের মাটিতে স্বর্ণপদক জিতেছে।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে কণ্ঠশিল্পী হাসিনা মমতাজ

কনক হোসেন

ষাট এবং সত্তরের দশকের নন্দিত কণ্ঠশিল্পী বেগম হাসিনা মমতাজ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় ধানমন্ডির জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। শিল্পী হাসিনা মমতাজ দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়াবেটিস ও বার্ধক্যজনিত নানান জটিলতায় ভুগছিলেন।

হাসিনা মমতাজ ১০ই মার্চ ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার মার নাম বিবি জুলফা খাতুন চৌধুরানী। তার স্বামী রফিকুল ইসলাম খান ছিলেন ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের মা তিনি।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ছাত্রী ছিলেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগীতের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা দেন তিনি।

৬০-এর দশক থেকে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন হাসিনা মমতাজ। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী ছিলেন। ষাট-এর দশক থেকে তিনি নজরুল গীতি, আধুনিক ও পল্লি গীতি গেয়ে আসছিলেন। সংগীতে অবদানের জন্য ২০১৯ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে শিল্পকলা পদক লাভ করেন তিনি।

'তন্দ্রাহারা নয়ন আমার', 'কেন এক বন্দি পাখি', 'ঐ দূরের বলাকা সাঁঝের আকাশে', 'মন নেবার আগে', 'সাতটি সাগর পাড়ি দিয়ে', 'আমার যেন একটু সময় নেই হাতে'র মতো জনপ্রিয় গানের জন্য দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি।

১৯শে ফেব্রুয়ারি বাদ জোহর ধানমন্ডি ৬/এ ঈদগাহ মসজিদে জানাজা হয় তার। গুণী এই শিল্পীর জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের ঢল নেমে আসে। এর মধ্যে সংসদ সদস্য, সরকারের সচিব, বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, ব্যাংক মালিক, স্টক এক্সচেঞ্জের নেতা, বীমা ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা শোক জানিয়েছেন। জানাজা শেষে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আমরা এই গুণী শিল্পীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 09, March 2024, Tk. 25.00

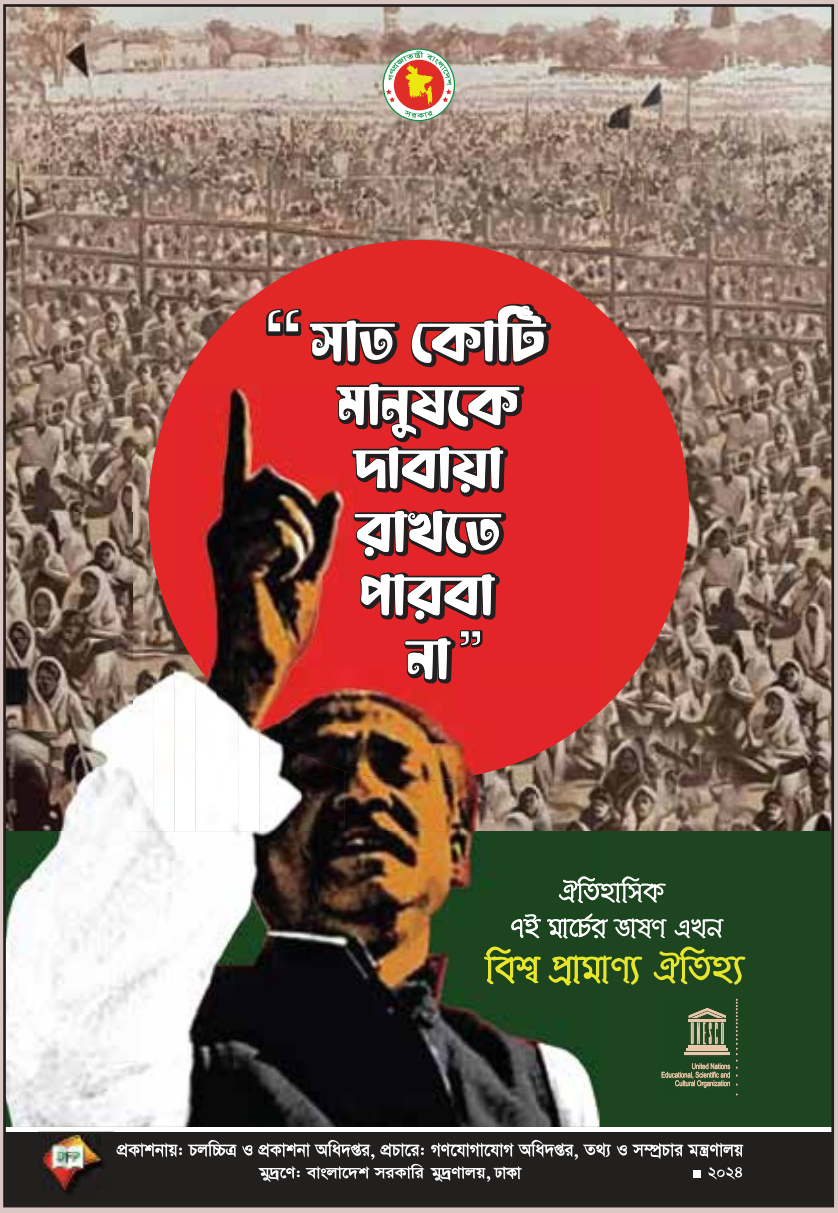

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd